শ্রীশ্রীভক্তমাল।

'শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরস আস্বাদ লাগিয়া।
তাঁর ভক্তগুণ গাই অভেদ জানিয়া॥
বিনা ভক্তপূজা কৃষ্ণপূজা নহে সিদ্ধ।
ভক্তপূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বদ্ধ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তনু মন।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ রতন॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দেখ গীতাশাস্ত্র মতে।
যে যেমন ভজে তা'রে ভজে সেই রীতে

"হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ
সুবৃত্তা বা দুর্ব্বৃত্তা বা তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ
ভগবদ্ভক্ত-পাদাব্জ-পাদুকাভ্যো নমোহস্তু মে
যৎসঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাখিল সত্তমম্॥"

শ্রীনির্ম্মল কুমার মিত্র।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীনির্ম্মল কুমার মিত্র।
২।১, শ্রীনাথদাস লেন,
বউবাজার, কলিকাতা।

ফাইন আর্ট প্রেস হইতে
শ্রীনগেন্দ্রনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত
৬০নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ।

পিতা, তুমি নিত্যধামে করিছ বিরাজ ;
প্রেমঘন মূর্ত্তি তবু রাজে স্মৃতিমাঝ।
কৌমার যৌবন গেলে "আমি" থাকি যথা ;
দেহান্তে তেমনি "তুমি" আছ সত্য কথা।
ভ্রান্ত আমি, মতিহীন, অতি কুলাঙ্গার ;
না করিনু সেবা তব, করিব না আর।
অকৃতি সন্তান আমি না শুধিনু ঋণ ;
পাপে হতচিত্ত তা'য় উদভ্রান্ত মলিন।
তবু যে স্বভাবগত করুণা তোমার ;
তা'র বলে রচিনু এ ভক্তকথা-হার।
তব দান তোমারেই করিনু অর্পণ ;
কি দিব তোমারে বিনা সেই মহাধন ?
এইরূপ ধর্ম্মগ্রন্থ বহু বার বার ;
আশীষ করিও যেন করিগো প্রচার।

ইতি— সেবকাধম
"নির্ম্মল"

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

চরিত্র

পৃষ্ঠা

সম্পাদকীয় নিবেদন।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থের একখানি সরল গদ্য সংস্করণ প্রকাশের বাসনা অনেক দিন হইতেই মনের মধ্যে নিহিত ছিল। আজ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও বৈষ্ণবভক্তগণের পদরেণু প্রার্থনা পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রসাদে প্রধান কয়েকটী চরিত্র সঙ্কলনে ব্রতী হইলাম—সাফল্য তাঁহাদের কৃপাকটাক্ষের উপর সমর্পণ করিলাম।

অনেকেই পদ্যসংস্করণ পাঠে অসুবিধা মনে করেন; এই গদ্য-সংস্করণ যদি কাহারও আনন্দবিধান করিতে পারে, জীবন ধন্য মনে করিব। ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও এই গদ্য-সংস্করণ পাঠে আনন্দ পাইবে আশা করা যায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও **শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত** মহাগ্রন্থযুগলের ন্যায় এই **মহাগ্রন্থও** বৈষ্ণব-মাত্রেরই সমান আদরের বস্তু এবং নিত্য অনুধাবনীয়। এই তিনটী মহাগ্রন্থের অধ্যয়ন ও আলোচনা ব্যতীত বৈষ্ণবধর্ম্মের মর্ম্মগ্রহণ সম্পূর্ণ হয় না। প্রথম **মহাগ্রন্থদ্বয়ের** মধ্যে যে **প্রেম-সঞ্চারিণী মহাশক্তি** বিদ্যমান এই **মহাগ্রন্থের** মধ্যেও সেই একই **মহাশক্তি** বিরাজমান। এই মহাশক্তির **স্ফূর্ত্তি** নিত্য আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তহৃদয়ে **অনুভব-সিদ্ধ** হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ একমাত্র ভক্ত ও ভগবানের সহিত **নিত্যযোগের** লীলাভূমি। এই সমস্ত লীলার বিষয় অধ্যয়ন করিলে শরীর পুলকে রোমাঞ্চিত হয় এবং চক্ষে প্রেমাশ্রুর ধারা বহে। এই সমস্ত **লক্ষণই** এই মহাগ্রন্থের প্রেমসঞ্চারিণী মহাশক্তির **পরিচয়**; সেই জন্যই ইহার পাঠে হৃদয় নির্ম্মল হয় এবং শান্তির স্নিগ্ধতায় মনঃপ্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

জীবের ভবদুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভের একমাত্র উপায় **সাধুসঙ্গ**; এই সাধুসঙ্গ সাধারণতঃ বড়ই দুর্লভ। **শ্রীশ্রীভক্ত-**

মাল গ্রন্থে প্রকটিত ভক্তচরিত্রের আলোচনা করিলে অনায়াসে সেই সুদুর্লভ সাধু-সঙ্গলাভে চরিতার্থ হওয়া যায়। এই সমস্ত ভক্তচূড়ামণিদিগের প্রণীত ভক্তিশাস্ত্রাদি এবং শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহাদি আজও তাঁহাদের ঐতিহাসিক সত্তার প্রমাণরূপে বিদ্যমান। কাজেই, তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত পাঠে আমাদের মন আকৃষ্ট হওয়া স্বাভাবিক এবং ভগবৎকৃপায় ইহাতে পরমানন্দ লাভও অনিবার্য্য।

ভগবৎচরিত্র যেরূপ অপ্রাকৃত, ভক্তচরিত্রও সেইরূপ। দেহ ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ ভক্ত ও ভগবানের হৃদয় অভিন্ন; স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন :—

"সাধবো হৃদয় মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যৎ তে ন জানন্তি, নাহং তেভ্যো মনাগপি॥"

যেখানে ভক্ত, ভগবানও সেইখানে থাকেন। সুতরাং ভক্ত ও ভগবানের চরিত্র একই সূত্রে গ্রথিত। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থ সেই ভক্তজনের—সুতরাং ভগবানেরও চরিতামৃতে পরিপূর্ণ।

ভক্তমালের রচয়িতা একনিষ্ঠ ভক্ত সাধুর নাম শ্রীশ্রীলালদাস; এই মহাত্মার জন্মস্থান, পিতামাতা, শৈশব, বিদ্যাভ্যাস প্রভৃতির পরিচয় দুষ্প্রাপ্য। তবে তাঁহার গ্রন্থপাঠে তিনি যে কিরূপ বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, শাস্ত্রপারদর্শী, সরল, বিনয়ী এবং ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত ছিলেন তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিশেষে ভক্ত, ভগবান্ ও বৈষ্ণবমহাজনদিগের শ্রীপাদপদ্মে প্রণিপাতপূর্ব্বক ভক্তচরিতপ্রিয়, সহৃদয় সুধীবৃন্দের করকমলে শ্রীশ্রীভক্তমালের এই আংশিক গদ্য-সঙ্কলন নিবেদন করিলাম—ত্রুটী মার্জ্জনীয়।

শুভ বৈশাখ, ১৩৩৭ সাল।
২।১ শ্রীনাথ দাস লেন,
বউবাজার, কলিকাতা।

ইতি—বিনয়াবনত—
বৈষ্ণবচরণাশ্রিত দীনাতিদীন
নির্ম্মলকুমার মিত্রদাস।

নবধা ভক্তিলক্ষণ।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥"

১। শ্রবণ—বিষ্ণুর নাম গুণাদি শোনা।

২। কীর্ত্তন— বিষ্ণুর নাম গুণাদি আলাপ ও গান।

৩। স্মরণ—সর্ব্বদা বিষ্ণুচিন্তা (অনুধ্যান): বিষ্ণুর নাম গুণাদির কথা মনে রাখা।

৪। পাদসেবন—পরিচর্য্যা, সেবা ইত্যাদি।

৫ অর্চ্চন—পূজা, প্রার্থনা, জপাদি।

৬। বন্দন— কায়মনোবাক্যে অবনত হওয়া।

৭। দাস্য—কর্ম্ম-সমর্পণ, যেমন প্রভুর আজ্ঞা ব্যতীত দাসের কোনো কর্ম্মে স্বাধীন অধিকার নাই।

৮। সখ্য—তাহাতে সমপ্রাণ সখার ন্যায় প্রীতি-বিশ্বাসাদি স্থাপন।

৯। আত্ম-নিবেদন—তাঁহার নিকট আত্ম-বিক্রয়; যেমন, গবাদি পশু অন্যের নিকট বিক্রয় করিলে তাহাদের ভরণ-পোষণের চিন্তা করিতে হয় না—যাহার নিকট বিক্রয় করা হয় তাহার উপরই সমস্ত ভার পড়ে—সেইরূপ ভগবানে আত্ম-বিক্রয় করিয়া দেহাদির সমস্ত ভার তাঁহার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত থাকাই আত্ম নিবেদন।

ভক্তিমাহাত্ম্য-কথন।

শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবৎ বৈয়াসকিঃ কীর্ত্তনে।
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্ঘ্রিভজনে লক্ষ্মীঃ, পৃথুঃ পূজনে॥
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেঽথ সখ্যেঽর্জ্জুনঃ।
সর্ব্বাস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরম্॥

অর্থাৎ :—

শ্রীবিষ্ণুর নামগুণাদি শ্রবণে **পরীক্ষিৎ**, কীর্ত্তনে ব্যাসনন্দন **শুকদেব**, স্মরণে **প্রহ্লাদ**, শ্রীচরণ-সেবনে **লক্ষ্মী ঠাকুরাণী**, পূজনে **পৃথু**, বন্দনে **অক্রূর**, দাস্যে কপিপতি **হনুমান্**, সখ্যে **অর্জ্জুন**, আর দেহ হইতে আত্মা পর্যান্ত সর্ব্বস্ব নিবেদনে **বলিরাজ** চরিতার্থ—**ইঁহাদের** সকলেরই নবধা ভক্তিলক্ষণের মাত্র **এক একটী অঙ্গ** সাধনে সর্ব্বতোভাবে **কৃষ্ণলাভ** হইয়াছিল ; সুতরাং **একত্র নব অঙ্গ** সাধকের পক্ষে কৃষ্ণ-লাভের তো কথাই নাই।

"ওঁ"

এইটী **ব্রহ্মবাচী** শব্দ, অর্থাৎ এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই প্রকৃতিগত ইহার অর্থে সেই এক বিরাট, অনন্ত **চিৎশক্তি** ব্রহ্মকে বুঝায়।

এই শব্দটী সংস্কৃত তিনটী ধাতুর আদ্য অক্ষরের সন্ধি করিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে—সেই ধাতু তিনটীর অর্থের মধ্যেই এই শব্দের অর্থ নিহিত এবং উচ্চারণের **সঙ্গে সঙ্গেই** সেই অর্থের **ভাবনা** করিলে এই শব্দের **উচ্চারণ সার্থক** হয়। সকল শুভকর্ম্ম এবং মন্ত্রাদির প্রথমেই এই শব্দ সেই জন্য উচ্চারণ করা হয় অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্মকে স্মরণ করিয়া সকল শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। সুতরাং এই ব্রহ্মবাচী শব্দের ধাতুগত অর্থ নিম্নে লিখিত হইল ঃ—

(১) অব্ ধাতু অর্থে **পালন**
(২) উষ্ ধাতু অর্থে **পীড়ন**
(৩) মন্ ধাতু অর্থে **সৃজন**

} = অ + উ + ম্ = ওঁ

অর্থাৎ যে বিরাট, অনন্ত **জ্ঞানময় মহাশক্তি** এই জগতের সৃজন, পালন ও সংহার-ধর্ম্মসম্পন্ন। এই ব্রহ্মনিরূপণ অতীব দুরূহ; "অবাঙ্‌মনসোঽগোচরম্" যিনি **তাঁহার** ধারণা এবং ব্যাখ্যান দুঃসাধ্য। তথাপি ভগবৎ-কৃপায় যতদূর সাধ্য আলোচনা এবং অভ্যাস-বলে যেটুকু বুঝিতে পারিয়াছি এবং অনুভব করিয়া আনন্দ পাইয়াছি ও পাইতেছি সেইটুকুই সংক্ষেপে এবং সহজভাবে ইহার পর পৃষ্ঠা হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বিষয়ে যদি কাহারও মতভেদ থাকে কিম্বা আলোচনা করিবার অভিপ্রায় হয় পত্রযোগে **জানাইলে বাধিত হইব।**

ওঁ

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো!
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো!
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম!
হা হা কদা নু, ভবিতাসি পদং দৃশো র্মে।

The central fact of human life is to come into a direct realization of our oneness with the Spirit of Infinite Life—the ultimate aim of human existence.

পর্য্যবেক্ষণ করিলেই দেখা যায় এই বিশাল জগৎ অপরিমেয় চিৎশক্তিদ্বারা সুনিয়মে পরিপালিত! এই নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম ঘটিলেই সৃষ্টিধারার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী; যেমন আপনার কক্ষের উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন যদি মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হয় তৎক্ষণাৎ সূর্য্যকর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ইহার ভস্মীভূত হওয়া যে ধ্রুব সত্য ইহা বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণার বাণী। কাজেই এই বিরাট্ নিয়মের নিয়ন্তা যে অসামান্য একজন সতত ক্রিয়াশীল অবস্থায় পশ্চাতে বিদ্যমান আছেন তাহার ধারণা সহজেই অনুমেয়।

মানব-জীবনে দেখা যায়, "চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক্" এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়মার্গে "রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ"-মাত্রায় অনুভূতি

ছাড়া "জগৎ" বলিতে আমাদের অন্য কিছু ধারণা করিবার বস্তু নাই। এই রূপরসাদি বিষয়গুলি একে একে পরিহার করিলে "জগৎ" আমাদের কাছে বাস্তবিকই থাকে না।

এখন ভাবা উচিত, রূপরসাদি বিষয়গুলি আমাদের মনের উপর কিভাবে আধিপত্য করে এবং ভাবিলেই বোঝা যায়, প্রত্যেক বিষয়েরই সাধারণ ধর্ম্ম "**রস**"—অর্থাৎ যে গুণে আমাদের দেহমনে বিশেষ বিশেষ "আনন্দ" স্পন্দনের অনুভূতি আসে।

উপনিষতের বাণী অনুযায়ী ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের নির্দ্দেশ "**রসো বৈ-সঃ**"—অর্থাৎ তিনি "**রসস্বরূপ**"। এই সত্যের উপলব্ধি করিতে হইলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পঞ্চরসের **মূল** অবস্থা ব্রহ্মেরই বহুধা **প্রকাশ** মনে করা যুক্তি-সিদ্ধ, যেহেতু "রস" বলিতে বাস্তব জ্ঞেয় রস ভিন্ন অন্য কোনো অজ্ঞেয় রসের ধারণা অনুভূতির সহিত গ্রহণ করিবার উপায় নাই—"**সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম**"।

এই "**রস**" বা আনন্দস্পন্দনের **মূল** অবস্থা না বুঝিয়া ভ্রান্ত উপভোগে জীবজগৎ মুগ্ধ !!

"দেহ চায় সুখের সঙ্গম
চিত্ত বিহঙ্গম সঙ্গীত সুধার ধার ;
প্রাণ চায় হাসির হিন্দোল,
মন সদা লোল যাইতে দুঃখের পার।"

উপনিষৎ-নির্দ্দিষ্ট "**রসস্বরূপ নারায়ণকে**" * উপলব্ধি করিতে হইলে এই বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার **বিহার** কোথায় এ বিষয়ের অনুধাবন আবশ্যক—বিশ্ব প্রকৃতির **বাহিরে** কোথাও তাঁহাকে পাইবার বাসনায় শত শত বেদান্ত বিচারেও

* "অর্থাৎ যিনি জীবের আশ্রয়"

আমাদের আত্মার বাস্তবিক ক্ষুধার তৃপ্তি হয় না। সেই জন্যই শ্রীমদ্‌ভগবৎগীতায় আছে :—

(ক) যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥ ৬।৩০

(খ) অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২

এখন, **তাঁহাকে** সর্ব্বত্র দেখিতে হইলে আমাদের নিত্য বোধগম্য "পঞ্চরস"কে **তাঁহারই আগমন-স্পন্দন** ভাবনা ছাড়া অন্য উপায় নাই। সেই ভাবনার ধারা এইরূপ :—

জাগ্রত অবস্থায় আমরা অহরহঃ "অন্ন, জল, আকাশ, বাতাস ফল, ফুল, সঙ্গীত" † ইত্যাদির সংস্পর্শে যে আনন্দ-স্পন্দন দেহ মনে **সত্য সত্য** উপভোগ করি সেই স্পন্দনের **সঙ্গে সঙ্গে** ধ্যান করা উচিত—"**রসস্বরূপ তিনি**" "**আনন্দ ঝঙ্কারে এই আমার কাছে এলেন**"—এবং আনন্দ-স্পন্দন ধমনীতে বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্ত কেবল **সেই সেই রসধারে** আমার সঙ্গে "**তাঁহারই**" বিহার—এই কথা বাস্তব অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবনা করাই স্বাভাবিক "**যোগ**"। এই ভাবনা প্রণালী অনুযায়ী ক্রমশঃ ধীরে ধীরে অভ্যাস করিলেই অচিরে, অনায়াসে ও সর্ব্ব অবস্থায় সেই **আনন্দময়ের** সঙ্গে **যোগানন্দে** ‡ বাস্তব অনুভূতির সহিত স্থিতিলাভ সুনিশ্চিত এবং **সর্ব্বব্যাপী নারায়ণের** সহিত আমাদের যে **নিত্যবিহার** চলিতেছে তাহার **প্রত্যক্ষ** বোধ জন্মে। গীতায় আছে :—

† বীজং মাং সর্ব্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ! সনাতনম্॥ গী :—৭।১০

‡ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।"

(১) "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।"

গী :—৭।১৭

"জ্ঞানী তু আত্মা এব"—অর্থাৎ আত্মস্বরূপ।

গী :—৭।১৮

(২) "বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।"

গী :—৭।১৯

তদ্‌ভাবাপন্ন

বহু জন্মের পর শেষ জন্মে জ্ঞানবান্ অর্থাৎ নিত্যযুক্ত হইয়া সর্ব্বাত্মদৃষ্টিদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন্।

আহারের সময় অন্নাদির রসগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ধারণা কর্ত্তব্য—"হে অন্নরূপি নারায়ণ! শরীরে শক্তি ও অরোগিতা, হৃদয়ে ভক্তি ও মনে শান্তি বিধান কর।" গ্রাসে গ্রাসে যতবার এই কথা ভাবনা করা যায় ততই ভাল। স্নানের সময় জলসিঞ্চনে স্নিগ্ধতা অনুভবের সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে ভাবনা কর্ত্তব্য—"হে স্নেহ-রূপি* নারায়ণ! এস এস, তোমার প্রেম-প্রস্রবণে আমার মানসিক ক্লেদ, দুঃখের অবসান হোক্।"

অন্য অন্য বিষয় ভোগের সঙ্গে সঙ্গেও এইরূপ ভাবনার সূত্র ধরিয়া থাকা যোগসিদ্ধির অনুকূল। কিছুদিন পরীক্ষা করিলেই দেহমনে আনন্দঘন অবস্থা অনুভূত হয়।

এই চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে নিয়মিত অভ্যাসবলে ঘনীভূত হইলেই জীবের ভাবসমাধি স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়।

---

* "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়"। গী :—৭।৮

অন্যদিকে, রূপরসাদি বিষয়-গ্রহণ ইন্দ্রিয়ধর্ম্মমাত্র-বোধে ভোগবৃত্তিই আমাদের বিষয়াসক্তিজনিত নানা দুঃখের কারণ এবং এইভাবে ভোগবৃত্তিই প্রকৃত ইন্দ্রিয়াচার।

"জ্ঞানাধিকরণমাত্মা"—জ্ঞানের অধিকরণ অর্থাৎ আধারই "আত্মা" এই শব্দের দ্বারা বোঝায়—যিনি রূপরসাদি বিষয়ের গ্রহণকর্ত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা; দৃক্ এব অর্থাৎ যিনি দ্রষ্টা তিনিই আত্মা—One who perceives.

"দৃশ্যম্ সর্ব্বম্ অনাত্মা"—দৃশ্যম্ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা কিছু তৎসমুদয় "অনাত্মা" এই শব্দে বোঝায়।

এই অনাত্মার মধ্যে এবং বাহিরে সর্ব্বত্র সেই "পরমাত্মা" অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের "অতীত" বিরাট্ জ্ঞানময় অনন্তশক্তি বিরাজমান। Unconditioned by Time, Space and Causality.

"জীবাত্মা" অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের "অধীন" সীমাবদ্ধ শক্তি জীবদেহে উপাধিবিশিষ্ট হইয়া এবং রূপরসাদি বিষয়ের অযথা ও ভ্রান্ত* উপভোগে বদ্ধ হইয়া অনন্তের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য জন্মজন্মান্তর ভ্রাম্যমান—Conditioned by Time. Space & Causality.

* যথা :—অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল-সমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥
গী :—১৬।১৬

এই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সহিত সম্বন্ধকে আচার্য্য শঙ্কর "সমুদ্রস্ত তরঙ্গবৎ" তুলনা করিয়াছেন—অর্থাৎ বিশাল জলরাশি, স্থির, গম্ভীর সমুদ্রে বায়ুর আঘাতে যে স্পন্দনের

উদ্ভব হয় সেই **তরঙ্গ** বাহ্যতঃ অর্থাৎ "তরঙ্গ" এই ক্ষুদ্র "**আকারে**" সমুদ্র হইতে ভিন্ন; কিন্তু সেই বিশাল জলরাশি বিরাট্ সমুদ্রের প্রত্যেক জলকণা—যে "**গুণসম্পন্ন**," আকারে দেখিতে ক্ষুদ্র যে তরঙ্গ তাহারও প্রত্যেক জলকণা **সেই** গুণসম্পন্ন।

সেইরূপ "**পরমাত্মা**" যিনি বিরাট্, অনন্ত, চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি তিনি "**একোঽহম্ বহুঃ স্যাম্**" অর্থাৎ "**একা আমি হই বহু**" এই বাসনারূপ বায়ুহিল্লোলে স্পন্দিত হওয়ায় স্বীয় **প্রকৃতির মধ্যে** দেহমন ইত্যাদি আকার ও উপাধিবিশিষ্ট জীবাত্মায় "**তরঙ্গায়িত**" হইয়াছেন।

"প্রকৃতিম্ স্বাম্ অবষ্টভ্য সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।"

গী ঃ—৯।৮

এই বহুরূপধারণের "**বাসনা**" সমুদ্রে তরঙ্গ উৎপাদিকা শক্তিসম্পন্ন "**বায়ু**"র সঙ্গে তুলনীয়।

"**একোঽহম্ বহুঃ স্যাম্**"—একা চিৎশক্তি তিনি যে বহুরূপ ধারণ করিয়াছেন ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, এবং তাঁহার বহু হওয়াটাও কিছু আশ্চর্য্যের নয়, যেহেতু শক্তি শব্দের অর্থে "**কার্য্যকারিতা**" কথাটী অচ্ছেদ্যসম্বন্ধে জড়িত আছে—Force implies Action. শক্তির ধর্ম্মই কিছু না কিছু করা—নিষ্ক্রিয়তা নয়। কাজেই এই অনন্ত চিৎশক্তির কর্ম্মও অনাদি অনন্তকাল হইতে অনন্তভাবে হইয়া আসিতেছে। এই কার্য্যকারিতার নিদর্শনই আমাদের এই জগৎ (জড় ও চেতন উভয় ভাবেই দৃশ্যমান)—এবং আরও কত কি!! এই শক্তির নাম **মায়াশক্তি**।

এখন, আমাদের সাধন-প্রণালী অনুযায়ী তাঁহার এই বহুরূপ ধারণের কারণ জিজ্ঞাসার উত্তর :—

একা আমি হই বহু—কেন ?

"দেখিতে আপন রূপ"

অর্থাৎ আমি তোমাকে দেখার তথ্য "আমি আমাকেই দেখি"—ইহাই "**আত্মদর্শন**"।

আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, শত্রু, মিত্র, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতির সহিত বাসের সময় আমাদের সাধনপ্রণালী অনুযায়ী এইরূপ "**ভাবনাসূত্র**" স্মরণ রাখিলেই ক্রমশঃ নিয়মিত **অভ্যাস** বলে ধীরে ধীরে সর্ব্বজীবে দয়া, ভালবাসা ও **সমবুদ্ধি** স্বভাবসিদ্ধ হইয়া দাঁড়ান অনায়াসে সম্ভবপর। গীতায় আছে :—

অভ্যাস-যোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ গী :—৮।৮

(১) সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীন-মধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ গীঃ—৬।৮

(২) আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।

(পণ্ডা=বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি=সমবুদ্ধি সর্ব্বজীবে যাঁর আছে)

যেমন গীতায় আছে :—

(১) বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে*চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ গীঃ—৫।১৮

(২) সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ গী :—৬।২৯

---

* চণ্ডাল

যোগযুক্ত ব্যাক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে আত্মস্থ দেখেন।

"বহুরূপ সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম* করে যেই জন
সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

গীতায় আছে ঃ—

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥ গী ঃ—৬।৩২

(হে অর্জ্জুন, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর সুখদুঃখকে নিজের সুখদুঃখের মত বোধ করেন সেই যোগীই শ্রেষ্ঠ।)

জীবের দেশকাল নিমিত্তের দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ অবস্থার বিনাশ সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত জীবকে জন্মজন্মান্তর দেহ-ধারণের মধ্যে যাতায়াত করিতে হয়; যেমন ক্ষুদ্র "তরঙ্গা-কারে" তরঙ্গ সীমাবদ্ধ থাকায় ও বিশাল, স্থির, গভীর সমুদ্রে লীন না হওয়া পর্য্যন্ত তার গতি অনন্ত। যথা ঃ—

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়। ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥
গী ঃ—১৬।২০

অন্যদিকে—বিবেক, বৈরাগ্য ও অভ্যাসবলে তাঁহার সঙ্গে নিত্যযোগে বিহার করিতে করিতে ভাবসমাধিস্থ হইলেই জন্মজরা-মৃত্যুর অতীত হওয়ার অবস্থা আসে। যেমন তরঙ্গের ক্ষুদ্র

* সমবুদ্ধি

আকার বিশাল সমুদ্রগর্ভে লীন হইলে তাহার পুনরুৎপত্তি ঠিক **সেই আকারে ও সেই পরিমাণে** অসম্ভব।

যথা :—

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ! নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্*।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥
আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥

গী :—৮।১৪-১৬

এই **নিত্যযোগে** বিহার প্রণালী আত্মকল্যাণের জন্য **সুধীবৃন্দের** অনুভাবনীয়।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ গী :—৬।৫

স্বকৃত যত্নের দ্বারা নিজের উদ্ধারসাধন কর্ত্তব্য। নিজেকে অধঃপাতিত করা উচিত নয়। নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু।

হে কৃষ্ণ! ত্বদীয়পদপঙ্কজপঞ্জরান্তে
অদ্যৈব মে বিশতু মানস-রাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে॥

যং ব্রহ্মবরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্-গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ॥

---

* অনিত্যং + মোক্ষং।

শ্রীশ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর চরিত্র

শ্রীমান্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী মহাভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার বৈরাগ্য বুদ্ধিও সেইরূপ প্রবল ছিল। দিবানিশি তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নামগান ও পূজা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাবলে তাঁহার এমন বৈরাগ্য জন্মিল যে হঠাৎ পিতার রাজসম্পৎ এবং অতুলনীয় ভোগসুখ বিষতুল্য জ্ঞানে পরিহার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণের দিবানিশি সেবা করিবার মানসে তিনি পুনঃ পুনঃ গৃহ হইতে পলায়ন করিতেন, কিন্তু প্রহরীরা সতর্ক থাকায় কেবলই তাঁহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া আনিত। পিতা মাতা এই হেতু দারুণ মনঃকষ্টে শেষে তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা হস্তপদে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। ইহাতে সাধু রঘুনাথ উগ্র উৎকণ্ঠায় "হা গৌরাঙ্গ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ভূমিতে পড়িয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শেষে শিষ্ট লোকেরা এই অনুচিত উপায়ের নিন্দাবাদ করায় এবং এইরূপ বন্ধনের অসারত্ব রাজাকে বুঝাইলে তাঁহার বন্ধন-মোচন হয়। ওদিকে কঠিন প্রহরীবেষ্টিত থাকিলেও এক রাত্রিকালে সুযোগ পাইয়া তিনি পলায়ন করিলেন। উন্মত্তের ন্যায় তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পাগলের মত তৃণ, কণ্টক, জল, জঙ্গল উত্তীর্ণ হইয়া ১২ দিনে

শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম ধামে উপনীত হইলেন ও সেখানে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণে ক্রন্দন করিতে করিতে নিপতিত হইয়া শরণ লইলেন। মহাপ্রভু দয়ার্দ্র হৃদয়ে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেই তাঁহাতে প্রেমভক্তিরূপ মহাশক্তির সঞ্চার হইল। তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ ও পরম বৈরাগ্য দেখিয়া তাঁহাকে মহাপ্রভু নিজ পারিষদবৃন্দের মধ্যে প্রধান গণিলেন। পুরুষোত্তম মন্দিরের সিংহদ্বারে অযাচকবৃত্তি হইয়া তিনি পড়িয়া থাকিতেন—কিছুদিন পরে কুণ্ডমধ্যে মহাপ্রসাদের যে সব "শড়া" নিক্ষিপ্ত হইত তাহাই ধুইয়া ধুইয়া তণ্ডুলকণা যাহা পাইতেন প্রাণরক্ষার নিমিত্ত তাহাই আহার করিতেন। ইহা শুনিয়া মহাপ্রভু অতি আনন্দিত হইয়া ভক্তগণের কাছে তাঁহার প্রশংসা করিতেন। শেষে মহাপ্রভুর আদেশক্রমে দাসগোস্বামী বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ডের তীরে দিবানিশি রাধাকৃষ্ণ-প্রেমোল্লাসে বাস করিতে লাগিলেন।

পতিতপাবন দাস গোস্বামীর পাদপদ্ম আমাদের কৃষ্ণপ্রেম-নিধি লাভে সতত সহায় হউক।

শ্রীশ্রীরূপসনাতন গোস্বামীর চরিত্র।

শ্রীশ্রীরূপ ও শ্রীশ্রীসনাতন দুই সহোদর গৌড়ীয় বাদসাহের উজীর ছিলেন। হরিভক্তির প্রকট মূর্ত্তি তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে প্রতিভাসিত ছিল। সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, মহাপণ্ডিত, শুভমতি, শান্তশিষ্ট, সুশীল, সুধীর, প্রিয়ংবদ, পরোপকারে সর্ব্বদা একান্তমতি, সর্ব্বগুণাকর তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রেই সকলের মনে প্রেমানন্দের সঞ্চার হইত।

বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা নানা গ্রন্থের প্রণয়ণ করেন। কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডে যখন লোক মাত্রেই নিমজ্জিত ছিল সেই সময়ে তাঁহারা শুদ্ধ ভক্তিরূপা অমৃত মন্দাকিনী জগতে আনয়ন করিয়া ভক্তমণ্ডলীকে তাহার আস্বাদনে ধন্য করেন।

তাঁহাদের বুদ্ধি, প্রতাপ এবং রাজমন্ত্রিরূপে ধন ও ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের প্রেমলীলার কথা শুনিয়া তাঁহারা একদিন নিভৃতে রাত্রিযোগে প্রভুর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেন। মহাপ্রভু মাত্র সংক্ষেপে এই উপদেশ দিলেন ঃ—

বিষয় ত্যজিয়া হও নিশ্চিন্ত-হৃদয় ;
পশ্চাতে মিলিব পুনঃ কহিনু নিশ্চয়।

এই বলিয়া প্রভু পুরুষোত্তম-ধামে যাত্রা করিলেন। এদিকে প্রভুর কৃপাদৃষ্টি-মাত্রেই তাঁহাদের মনে বিষয়-ভোগ বাসনার অবসান হইয়া আসিল। শ্রীকৃষ্ণে তাঁহাদের পরম অনুরাগ জন্মিল ও বৈরাগ্য বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইল।

(ক) সর্ব্বপ্রথমে শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামী বিষয় ছাড়িয়া কৃষ্ণাবেশে উন্মত্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধামে পলায়ন করিলেন—অন্যদিকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী রাজকর্ম্মে অবহেলা করিয়া বৈরাগ্যবুদ্ধির সহিত

উৎকণ্ঠিত মনে দিবানিশি গৃহে বসিয়া বিরলে শাস্ত্র অনুশীলন করিতে লাগিলেন।

হঠাৎ তাঁহার রাজকর্ম্মে ঔদাসীন্য ও অনুপস্থিতি দেখিয়া বাদশাহ সংবাদ লইতে লোক পাঠাইলে তিনি শারীরিক অস্বাস্থ্য জ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে পুনরায় বৈদ্য পাঠাইয়া যখন জানিলেন তাঁহার শারীরিক কোনও অস্বাস্থ্য নাই তখন উৎকণ্ঠিত হইয়া বাদশাহ নিজেই সনাতনকে দেখিতে গেলেন। সনাতন তাঁহাকে সমাদরে বসিতে আসন দিয়া বাদশাহের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদাশহ ইহাতে প্রীতি লাভ করিলেন।

শেষে বাদশাহ সনাতনের রাজকর্ম্মে ঔদাসীন্য ও অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "তুমিও কি তোমার ভ্রাতার মতন সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করিয়াছ?" তাহাতে সনাতন মর্ম্ম-কথা নিবেদন করিয়া রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিতেই বাদশাহ এই বিচক্ষণ ব্যক্তির অভাব ক্ষতিজনক বুঝিয়া কৌশলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন।

সনাতন কারাগারে কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

শেষে বাদশাহ হঠাৎ একদিন দক্ষিণ প্রদেশে কোন প্রতিযোগীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ করিতে যাত্রা করিলে সনাতন কারারক্ষক প্রধান যবনের বহু মিনতি করিয়া সাত হাজার স্বর্ণমুদ্রাবিনিময়ে কারাবাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ যাচনা করিলেন। আরও বলিলেন "আমি আজন্ম তোমাদের উপকার করিয়াছি—এ সময়ে আমার এই প্রত্যুপকার করিলে তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের সদ্‌গতি লাভ হইবে এবং তুমিও অশেষ পুণ্যের অধিকারী হইবে।

যবন রাজদণ্ডের ভয়ে ইতস্ততঃ করিলে সনাতন তাহাকে

আশ্বাস দিয়া বলেন আমি সন্ন্যাসিবেশে দেশান্তরে কালযাপন করিব—বাদশাহের নিকট আমার কোনও উদ্দেশ-নির্ণয়ের সম্ভাবনা থাকিবে না; জিজ্ঞাসিত হইলে বলিও গঙ্গাস্নানে লইয়া গেলে সনাতন জলনিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

ইহাতে যবন আশ্বাস পাইয়া মুদ্রাবিনিময়ে সনাতনকে কারাবাস হইতে নিষ্কৃতি দিয়া তাঁহাকে গঙ্গাপার করিয়া দিল।

গোস্বামী নগর ছাড়িয়া বনপথে ফল, মূল এবং জল মাত্রে নির্ভর করিয়া "হা কৃষ্ণ! হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতে করিতে অবশেষে হাজিপুর স্থানের এক উদ্যানে পড়িয়া রহিলেন

ঘটনাক্রমে সেইদিন সনাতনের ভগ্নীপতিও উক্ত স্থানে ঘোটক কিনিবার জন্য আসিয়া ঐ উদ্যানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করিলেন, এবং নিদ্রা যাইবার সময় নিকটেই পরিচিত কণ্ঠে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নামে ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইলেন। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করিয়া রাজমন্ত্রী সনাতনকে দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য গণিলেন। মলিন বসন এবং অঙ্গবস্ত্রশূন্য দুর্দ্দশা দেখিয়া সজলনয়নে খেদোক্তির সহিত তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া তিনি বলিলেন—"হায় হায়, সনাতন! রাজ্যপদ ত্যাগ করিয়া এমন দশা কেন বরণ করিলে? মলিন বসন বর্জ্জন কর এস এস, গৃহে বসিয়া কৃষ্ণভজন করিবে; চিরসুখে বর্দ্ধিত তোমার এই অবস্থা চক্ষে দেখা আমার দুঃসহ—চল ভাই, বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে বাড়ীতে চল।"

সনাতন বলিলেন "না ভাই, ও কথা আর বোলোনা; আমার ভাগ্যে যা আছে তাই হবে—তুমি চিন্তা কোরোনা—ঘরে ফিরে যাও। আমার প্রাণগোবিন্দ আমার সঙ্গে সঙ্গে নিত্যবিহার করিবেন—তোমার কোনও ভয় নাই।"

সনাতনের উৎকট বৈরাগ্য দেখিয়া তিনি শীতনিবারণ হেতু

আপনার "শাল" বস্ত্র সনাতনকে দিলেও সনাতন উত্তম বোধে তাহা গ্রহণ করিলেন না—শেষে সনির্ব্বন্ধ অনুনয়নে একখানি রুক্ষ "ভোট্" কম্বল চোখের জলে লইতে বলায় সনাতন তাহা গ্রহণ করিলেন।

এই কম্বলখানি সার করিয়া সনাতন শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও বহুকষ্টে কাশীধামে উপস্থিত হইয়া গলদশ্রুধারায় গদগদভাবে "হা শ্রীচৈতন্য" বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে যাহাকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "ভাই, আমার হৃদয়নন্দন, সর্ব্বগুণাকর গৌরাঙ্গসুন্দরকে তোমরা কি কোথাও দেখিয়াছ ?"

এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় খুঁজিতে খুঁজিতে নির্ণয় করিয়া সনাতন শেষে ভক্ত চন্দ্রশেখরের গৃহদ্বারে বসিয়া পড়িলেন ; "নীচ অধম আমি, আমার পক্ষে ভিতরে যাওয়ার অধিকার কি আছে—দুয়ারেই বসিয়া থাকি"—এই মনে করিয়া বাহিরেই গৃহদ্বারে আশ্রয় লইলেন।

ওদিকে চিন্তামণি সর্ব্বজ্ঞের শিরোমণি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সনাতনবার্ত্তা বুঝিতে পারিয়া গৃহমধ্যে তাঁহার ভক্ত সেবককে বলেন "দেখ তো ! বাহিরে গৃহদ্বারে কোনও বৈষ্ণব বসিয়া আছেন—তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া আইস।"

সেবক ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন 'প্রভু, বৈষ্ণব তো বাহিরে কাহাকেও দেখিলাম না—একজন কাঙ্গালমাত্র মলিনবাসে বসিয়া আছে বটে।" প্রভু বলিলেন "সে যেই হউক তাহাকে ডাকিয়া লইয়া আইস।" কাজেই সেবক তাঁহাকে সমাদরে গৃহমধ্যে লইয়া আসিতেই সনাতন প্রভুকে দেখিয়াই তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আর্ত্তনাদের সহিত নিপতিত হইলেন।

সনাতনের দৈন্য-বিষাদ ও আর্ত্তনাদে কাতর হইয়া প্রভু ছলছল নয়নে সনাতনকে আলিঙ্গন দিতে উদ্যত হইলে সনাতন নিজ দেহ ঘৃণাস্পদ ও প্রভুর স্পর্শের অযোগ্য মনে করিয়া সভয়ে পিছাইয়া যাইতে যাইতে কাতরোক্তি করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন "**সনাতন**! তুমি দৈন্য সম্বরণ কর, তোমার দৈন্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়; কৃষ্ণ যে অতি দয়ালু, ভাল মন্দ তোমার ভক্তিবলে গণনা না করিয়া তোমাকে **বিষয়কূপ** হইতে উদ্ধার করিলেন; তোমার উপর তাঁহার যে কত দয়া সে কথা বলা যায় না। অহো! তুমি **কৃষ্ণভক্তিমতি,** তোমার দেহ এখন সম্পূর্ণ নিষ্পাপ—তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া আমার পবিত্র হইতে বাসনা বলবতী হইয়াছে।" এই বলিতে বলিতেই—প্রভু **সনাতনকে** আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া কাছে বসাইলেন।

অনন্তর প্রভু সনাতনের "ভোট" কম্বলের দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেই সনাতন মর্ম্ম বুঝিয়া ক্ষণেক পরেই উঠিয়া গিয়া জাহ্নবী-তীরে এক বৈষ্ণবের ছিন্ন-কন্থার সহিত আপনার কম্বলের বিনিময় করিয়া সেই ছিন্নকন্থা-গলে প্রভুর পাদপদ্মে আসিয়া দণ্ডবৎ হইলেন।

প্রভু সনাতনের গলায় ছিন্ন কন্থা দেখিয়া ছল ছল নয়নে সনাতনকে আলিঙ্গনভরে ধরিয়া তুলিলেন এবং সাধুবাদের সহিত বলিলেন "সনাতন! বহু দুঃখে "কৃষ্ণ পরম-ধন" পাওয়া যায়—দেহ, গৃহ, স্ত্রীপুত্র, বিষয়-বাসনা এমন কি **সর্ব্ব আশা** ত্যাগ করিলে তবেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।"

অনন্তর সনাতনের উপর প্রভুর অশেষ কৃপার উদয় হওয়ায় শক্তি-সঞ্চার পূর্ব্বক **নিজতত্ত্ব** প্রভু তাঁহাকে জানাইলেন। এবং সনাতনকে বৃন্দাবনে গিয়া শাস্ত্র-বিচারসহ **ভক্তিতত্ত্ব** প্রচার করিতে অধিকার দিলেন।

সনাতন তদনুযায়ী বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন ও তথায় বৃক্ষতলে বসিয়া আলস্যশূন্য হইয়া গ্রন্থানুশীলন ও ভক্তিতত্ত্ব-প্রচার করিতে লাগিলেন।

(খ) কালক্রমে গোস্বামীর এক চমৎকার **লীলার** সংঘটন হয়। একদিন তিনি যমুনায় স্নান করিতে করিতে এক **স্পর্শ-মণি** দেখিতে পাইলেন। ভাবিলেন এই মণির স্পর্শে যখন লৌহ স্বর্ণে পরিণত হয় তখন কোনও **সুযোগ্য** দরিদ্র দেখিলে তাহাকে দেওয়াই ভাল। এই ভাবিয়া হাতে স্পর্শ না করিয়া "থাপ্‌রাতে" ধরিয়া এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে বালুকাগর্ভে মৃত্তিকার আচ্ছাদনে সেই স্পর্শমণি পুঁতিয়া রাখিলেন।

দৈবযোগে কালক্রমে বর্দ্ধমানের দক্ষিণে অবস্থিত **মানকর** নিবাসী গৌড়দেশীয় বহু সন্তান-সন্ততিশালী অতি দরিদ্র **জীবন** নামধেয় এক ব্রাহ্মণ দারিদ্র্যদুঃখ খণ্ডন-মানসে বহু তপস্যা করিয়া দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনার ফলে স্বপ্নযোগে বৃন্দাবনে সাধু সনাতনের নিকট অভীষ্টলাভের জন্ম গমন করিতে আদিষ্ট হন। তদনুযায়ী তিনি বৃন্দাবনে আসিয়া কৃষ্ণনাম-ধ্যানরত সুকৃতি ব্রাহ্মণ সনাতনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে আনন্দের আবেশে দণ্ডবৎ হইলেন। ধ্যানান্তে গোস্বামী মহাশয় সম্মুখে প্রণত ব্রাহ্মণকে দেখিয়া মিষ্টবাক্যে সবিনয়ে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন "প্রভু! আমি বহু-সন্তানপ্রতিপালী, অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ; দারিদ্র্যখণ্ডন-হেতু বহুকাল রুদ্রের আরাধনা করায় মহাদেব আপনার শ্রীচরণে আশ্রয় লইতে আমাকে স্বপ্নে আদেশ করেন।"

সনাতন ইহাতে বিস্মিত হইয়া বলেন "সে কি কথা? আমি

ভিক্ষাজীবী দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তোমার অভীষ্ট-পূরণের উপযুক্ত অর্থ আমি কোথায় পাইব ?”

ইহা শুনিয়া **জীবনের** হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং স্বপ্নবৃত্তান্ত ভ্রান্তিমাত্র মনে করিয়া তিনি কাতরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

অভ্যাগত ব্রাহ্মণকে এতাদৃশ কাতর দেখিয়া দয়ার্দ্র হৃদয়ে আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সেই স্পর্শমণির কথা সনাতনের মনে পড়িয়া গেল। তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে বলিলেন “স্থির হও ঠাকুর! স্থির হও! মহাদেবের বাণী অতি সত্য বটে—আমার বিস্মৃতি ঘটিয়াছিল। এখন মনে পড়িল ; চল চল, যমুনার তীরে আমার প্রাপ্ত স্পর্শমণি তোমাকে দেখাইয়া দিব—গ্রহণ করিয়া তোমার অভীষ্ট পূরণ কর।”

এই বলিয়া ব্রাহ্মণকে যমুনাতীরে লইয়া গিয়া **সনাতন** বাম হস্তের তর্জ্জনী-সঙ্কেতে মৃত্তিকাপ্রোথিত স্পর্শমণির স্থান নির্দ্দেশ করিয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া স্পর্শমণি উঠাইয়া লইতে বলিলেন।

ব্যগ্রহৃদয়ে খুঁজিতে গিয়া প্রথমে ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি না পাইয়া সনাতনের সাহায্য প্রার্থনা করিলে সনাতন বলেন “আমি স্নান করিয়াছি, এখন উহা স্পর্শ করিব না; তুমি পুনরায় খুঁজিলেই পাইবে—হতাশ হইও না—চেষ্টা কর।”

পুনরায় চেষ্টা করিতেই এবারে, ব্রাহ্মণ স্পর্শমণি পাইবামাত্র তাঁহার হস্তের লৌহবলয় স্বর্ণময় হইল ; এই দেখিয়া পাছে আবার বঞ্চিত হইতে হয় সেই ভয়ে অতি ব্যগ্রভাবে সনাতনকে দণ্ডবৎ করিয়াই মণি লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু ভগবানের কি বিচিত্র বিধান! গরল চাহিতে তিনি ভক্তকে অমৃত-সাগর দিয়া থাকেন !! বিধাতা সদয় হইলে ভিখারীরও ধনসম্পত্তি-লাভ ঘটিয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ তো মণিলাভ করিয়া উৎফুল্ল হৃদয়ে নাচিতে নাচিতে গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন ; এদিকে তাঁহার সংসার-বন্ধনের কাল যে শেষ হইয়া আসিয়াছে তাহা তাঁহার জ্ঞানের অতীত !! মণি-লাভের হর্ষেই নিমগ্ন হইয়া তিনি চলিয়াছেন !

এইভাবে পথে চলিতে চলিতে হঠাৎ ভগবৎ-কৃপায় তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল ! যাইতে যাইতে ভাবিলেন "এ হেন অমূল্য নিধি "স্পর্শমণি" গোস্বামী আমাকে কিসের বলে দান করিতে সমর্থ হইলেন ? রাখিবার কথা দূরে থাক্ ইহা স্পর্শও করেন না, এমন কি ঘৃণায় দৃষ্টিপাত পর্য্যন্ত করেন না !"

"তবে নিশ্চয়ই আমি তুচ্ছ বস্তুর জন্য ভ্রান্তমনে মহাদেবের তপস্যা করিয়াছি—যে রত্নলাভে ধনী হইয়া সনাতন এ হেন মণিকে উপেক্ষা করিলেন আমাকে তাহারই সামান্য যাচনা করিতে হইবে —আমাকে এখনই তাঁহার শরণ লইতে হইবে। আমি তাঁহার শ্রীচরণে আত্মবিক্রয় করিব—নিশ্চয়ই তাঁহার অনুগ্রহলাভ হইবে।"

এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি মহাভাবের আবেশে **বটেশ্বর** গ্রাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া গোস্বামীর পদতলে ক্রন্দন করিতে করিতে লুটাইয়া পড়িলেন ও মনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "প্রভু ! এ তুচ্ছ রত্নে আমার আর কামনা নাই—আপনার অভয় পদে শরণাপন্ন এই দীনহীন অধমকে কৃষ্ণপ্রেমধনে কৃতার্থ করুন।"

সনাতন বলিলেন "বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিয়া যদি স্পর্শমণি বর্জ্জন করিতে পার, তবেই তুমি কৃষ্ণভজনের অধিকারী হইয়া প্রেমনিধি লাভ করিতে পারিবে।"

এই কথা শুনিয়াই ব্রাহ্মণ টান মারিয়া স্পর্শমণি যমুনা-মাঝারে নিক্ষেপ করিলেন। সনাতন ইহাতে অতি আনন্দিত হইয়া ব্রাহ্মণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার করিলেন। ব্রাহ্মণ

কৃতার্থ হইয়া সর্ব্বদুঃখনাশের পর ধনাঢ্য হইয়া জগতে ধন্য, মান্য ও পূজ্যতম হইলেন। তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণ অদ্যাপি কাঁটামাড়-গ্রাম-নিবাসী "গোস্বামী" নামে খ্যাত।

(গ) সনাতন গোস্বামীর পরম পবিত্র, চমৎকার, অনন্ত, অপার লীলার মধ্যে আর একটী এখানে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী **কুব্জা** মহিষী-প্রতিষ্ঠিত,মনোমোহন শ্রীমন্ মদনমোহন বিগ্রহসেবার ভার মথুরা চৌবের স্ত্রীর উপর ন্যস্ত হয়। তিনি কিন্তু মদনমোহনের সেবা শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিবার আগ্রহে লৌকিক আচার বিচারের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন না। ভক্তিমতী এই নারীর সেবাও ভক্তবৎসল মদনমোহন সাদরে নিত্য গ্রহণ করিতেন।

এদিকে কালক্রমে সনাতন গোস্বামী এই ভক্তিমতীর ভবনে মাধুকরী ভিক্ষার নিমিত্ত নিত্য গমন করিতে করিতে চৌবেগৃহিণীর অনাচারে মদনমোহন-সেবা দেখিয়া তাঁহাকে আচার প্রণালীর উপদেশ দিলেন। কিন্তু চৌবেগৃহিণী এই সমস্ত আচারের বিষয় গ্রাহ্য না করিয়া আপনার স্বাভাবিক প্রেমভাবেই বিগ্রহ-সেবা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সনাতন একদিন হঠাৎ দেখেন শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুর আচার বিচার গণনা না করিয়া চৌবের বালকের সহিত একত্র বসিয়া অন্ন ভোজন করিতেছেন!! ভগবানের প্রেম-লীলা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীশ্রীমদনমোহন এই দৃশ্য সনাতনের নিকট প্রকট করিলেন। গোস্বামী মহাশয় এই দৃশ্যে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং চৌবের গৃহিণীকে পরম ভাগ্যবতী স্থির করিয়া তাঁহার প্রতি আচার বিচার শিক্ষাদেওয়ায় আপনাকে অপরাধী জ্ঞানে তাঁহাকে করযোড়ে সবিনয়ে বলিলেন "মাতঃ! তুমি যেমন আচারে মদনমোহনের সেবা

করিতে তেমনই করিবে, অন্য মতের তোমার ন্যায় সৌভাগ্যবতীর প্রয়োজন নাই।" চৌবের গৃহিণী বলেন "বাবা! আচার-পালনে মদনমোহন-সেবার অনেক বিলম্ব হয় বলিয়া আমি আচার-বিচার সমস্তই তাঁহার শ্রীপদে সমর্পণ করিয়াছি।"

অনন্তর গোস্বামী বলেন "মাতঃ! আজ আমার একমাত্র নিবেদন "মাধুকরী-স্বরূপ" তোমার শিশুর ভোজনাবশেষ এই পাত্র হইতে যাহা কিছু আছে আমাকে দয়া করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব"। ভেদজ্ঞানহীনা, শুদ্ধমতি চৌবেগৃহিণী নিঃসংকোচে গোস্বামীকে তাহাই তৎক্ষণাৎ দান করিলেন!! রহস্য জানিবার জন্য কৌতূহলের লেশমাত্র তাঁহার মনে স্থান পাইল না!!! প্রসাদ পাইয়া সাধু সনাতন কৃতার্থ মানিয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া "কৃষ্ণনাম" গাহিতে গাহিতে আত্মহারাপ্রায় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

লীলাময় শ্রীশ্রীমদনমোহন সেই রাত্রেই শ্রীমান্ সনাতনকে স্বপ্নযোগে আদেশ করেন "তুমি আমাকে চৌবের ভবন হইতে লইয়া গিয়া কেবলমাত্র তুলসী-পত্র ও গঙ্গাজলে সেবা কর।" ওদিকে চৌবে-ঠাকুরাণীর প্রতিও আদেশ করেন "তুমি আমাকে সনাতনের হস্তে সমর্পণ কর।"

পরদিন প্রাতঃকালে সনাতন মহান্ হর্ষভরে চৌবে-ঠাকুরাণীর ভবনে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মদনমোহনের আদেশ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন "প্রভুর মনে আমার সহিত বনবাসের সাধ হইয়াছে!"

ঠাকুরাণীও বলিলেন "হাঁ, হাঁ, সত্য বটে; আজন্ম যাহার শঠতাই ধর্ম্ম সেই শঠচূড়ামণি আমাকেও বলিল "স্থানান্তরে যাইব!" জন্মগত স্বভাব সে কিরূপে ছাড়িবে? শ্রীমতী যশোদা যাহাকে প্রাণপণে

প্রতিপালন করিলেন তাঁহারই বুকে শেল হানিয়া সে চকিতে পলায়ন করিল! শুকপক্ষীকেও দেখ—দুধ ছোলা দিয়া তাহাকে বৰ্দ্ধিত-কলেবর করিলেও সে শিকল কাটিয়া উড়িয়া পালায়। যাহার যা' স্বভাব তাহা কোথায় যাইবে? অভিমানভরে বলিলেন "ভাল, মদনমোহনের অভিলাষ পূর্ণ হোক্, সে যায় যাক্—আমার তা'তে ক্ষতি কি? যদি অন্তরে এই নিদারুণ দুঃখের বেগ সহ্য না করিতে পারি আমার মরিবার জন্য যমুনার জল তো আছে!!!"

শুদ্ধ বাৎসল্যরসের এই সপ্রেম ভৎ'সনা শুনিয়া সনাতন গলদশ্রুধারে প্রেমানন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। মাতা চৌবেগৃহিণী শ্রীল সনাতনকে মদনমোহন-বিগ্রহ দান করিয়া যশোদা মাতার ন্যায় আর্ত্তনাদসহ হতচেতন হইয়া ভূমিতে গড়াইয়া পড়িলেন ও তাঁহার ভাবসমাধি লাভ হইল।

(ঘ) এদিকে সনাতন শ্রীশ্রীমদনমোহন-লাভে দরিদ্রের নিধি পাইলে যেমন আনন্দ হয় সেইরূপ অতি হৃষ্টচিত্তে শ্রীবৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত আপনার আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেখানে সূর্য্যঘাটের নিকট তৃণ দিয়া "ঝোপড়া" বাঁধিয়া মুষ্টিভিক্ষা দ্বারা হর্ষবিষাদে তিনি মদনমোহনের সেবা করিতে লাগিলেন।

মদনমোহন একদিন বলেন "লবণ-বিহীন ভোগে আমার রুচি হয় না"। সনাতন বলেন "নিত্য লবণই বা আমি কোথায় পাইব"? শেষে লবণ সংগ্রহ হইলে মদনমোহন বলেন "রুক্ষ ভোগ খাইতে পারা যায় না"। সনাতন তাহাতে বলেন "ক্রমে ক্রমে তুমি নানা ছলনা করিতে আরম্ভ করিলে! আমি ঘৃত-শর্করা কোথায় পাইব? আমার দ্বারা বিষয়ীর নিকট ভিক্ষা করিতে যাওয়া পোষাইবে না। যদি নেহাৎ খাইতেই না পার, তুমি স্বয়ং বিষয়ীর নিকট ভিক্ষার চেষ্টা দেখিতে পার।"

অনন্তর ঘটনাক্রমে একদিন মদনমোহনের লীলা-অনুযায়ী এক মহাজন বহু পণ্যদ্রব্য লইয়া নৌকাযোগে মথুরায় যাইতে নৌকাটী চড়ায় আট্‌কাইয়া গেল। মহাজন নানা চেষ্টায় নিষ্ফল হইলে সর্ব্বনাশ গণিয়া "হাহাকার" করিতে লাগিলেন। শেষে রাত্রিযোগে দেখেন নদীতীরে এক সাধু গদগদভাবে "কৃষ্ণনাম" জপিতেছেন এবং সম্মুখে এক শ্রীবিগ্রহ আপনার তেজোরাশিতে বন আলোকিত করিয়া বিরাজমান রহিয়াছেন।

এই সুযোগ দেখিয়া **মহাজন** সনাতন-সমীপে ক্রন্দন করিতে করিতে তাঁহার অনুগ্রহ-লাভের আশায় শরণাপন্ন হইলেন। মহাজন প্রতিজ্ঞা করিলেন "এবার বাণিজ্যে যত উপস্বত্ব হইবে সমুদয় শ্রীচরণপদ্মে সমর্পণ করিব এবং শ্রীবিগ্রহের জন্য মন্দির নিম্মাণ করাইয়া সুনিয়মিত, যথাযোগ্য সেবার প্রতিষ্ঠা করিব"।

মহাজনের প্রার্থনা-অনুযায়ী সাধু সনাতনের আশীর্ব্বাদে মহাজন নৌকায় উঠিতেই নৌকা চলিতে লাগিল!

মথুরায় যাইয়া বাণিজ্যে দ্বিগুণ লাভ হইলে তিনি বুঝিলেন ইহা মদনমোহনের অনুগ্রহবলেই ঘটিল। তিনিও প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী সমস্ত লভ্য মদনমোহনের অর্থে খরচ করিয়া বৃহৎ মন্দির, নাট্যশালা, বিহারের স্থান ও নানাবিধ উপাদেয় ভোগের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

শ্রীমৎসনাতন সেই মন্দিরে তখন হইতে অতি হৃষ্টচিত্তে ও নিশ্চিন্তমনে মদনমোহনের সেবা করিয়া প্রেমানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। অদ্যাপি সেই মন্দির গোস্বামিপাদের তত্ত্বাবধানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

শ্রীমৎসনাতন গোস্বামীর পাদপদ্ম আমাদের কৃষ্ণ-ভক্তিলাভে চির সহায় হউক।

শ্রীশ্রীরূপ গোস্বামীর চরিত্র।

শ্রীমদ্ সনাতন গোস্বামীর ন্যায় শ্রীমদ্-রূপগোস্বামীরও ভক্তি-মাহাত্ম্যের সীমা নাই। এখানে একটী মাত্র লীলার বর্ণনা হইতেছে :—

একদিন শ্রীবৃন্দাবনের ব্রহ্মকুণ্ডতীরে বসিয়া শ্রীরূপগোস্বামী অনাহার-ব্রত অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান-নিরত ছিলেন। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের মনে ভক্তের এই অনশন-ক্লেশ অসহ্য হওয়ায় তিনি গ্রাম্য বালকের বেশে এক ভাণ্ড তপ্ত দুগ্ধ তাঁহার ভক্তের সেবার জন্য সম্মুখে নিবেদন করিয়া চলিয়া গেলেন।

ক্ষুধায় দুগ্ধপান করিতে করিতে কোটি অমৃততুল্য অলৌকিক আস্বাদন পাইয়া শ্রীরূপ নির্ণয় করিতে পারিলেন না "কে এই অদ্ভুত বালক এমন অপূর্ব্ব দুগ্ধ নিবেদন করিয়া গেল" !!!

অপ্রাকৃত বস্তুর এমনই মহিমা যে দুগ্ধ পান করিতে করিতেই শ্রীরূপ প্রেমভাবাবেশে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ওদিকে দুগ্ধ পান শেষ করিয়া ভাণ্ড ভূমিতে রাখিতেই সেই অপ্রাকৃত পাত্র অদৃশ্য হইল !!

শ্রীমদ্ সনাতন এই সংবাদ কোনও ভক্তমুখে শুনিবামাত্র শ্রীরূপ-সমীপে উপস্থিত হইয়া বহু আর্ত্তনাদের সহিত তাঁহার অনশনব্রতের জন্য অনুযোগ করিয়া বলিলেন "ভাই শ্রীরূপ! কেন বৃথা অনশনে থাকিয়া প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের কোমল হৃদয়ে দুঃখ দাও? মাধুকরী ভিক্ষা-দ্বারা ক্ষুধার শান্তি করিও—সুকুমার কৃষ্ণচন্দ্রকে আর দুঃখ দিও না।"

তদনুযায়ী শ্রীরূপ মাধুকরী ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া একান্ত মনে কৃষ্ণভজনে নিমগ্ন থাকিতেন।

ওদিকে গোবিন্দের কি অপরূপ লীলা দেখ !! তিনি শ্রীরূপকে আদেশ করিলেন "ওমুক স্থানের মৃত্তিকা-ভিতরে যোগপীঠে আমি বাস করিতেছি ; এক গাভী নিত্য সেখানে আসিয়া দাঁড়ায় ও তাহার স্তন হইতে আমার মস্তকে দুগ্ধ স্বতঃ ক্ষরিত হইয়া থাকে। এই সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়া তুমি সেই স্থান খনন পূর্ব্বক আমাকে উঠাইয়া আনিয়া সেবা করিবে।"

তদনুযায়ী শ্রীরূপ গোস্বামী গোবিন্দবিগ্রহকে মৃত্তিকা হইতে উঠাইয়া আনিয়া যথাবিধি তাঁহার অভিষেক-আদি নিষ্পন্ন করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া প্রেমানন্দে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন।

শ্রীমদ্‌রূপ-গোস্বামীর শ্রীচরণছায়া আমাদের সংসারতপ্ত হৃদয়ের আশ্রয় হউক।

শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট চরিত্র।

কৃষ্ণপ্রেমরসময়, অদ্ভুত-চরিত্র শ্রীমান্ গোপাল ভট্টের চরিত্র পরম আনন্দজনক ও শ্রবণমঙ্গল। ভট্টগোস্বামী মহাপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র ; মহাপ্রভু তাঁহার উপর অতীব প্রীত হইয়া তাঁহাকে মধুর হরিনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত করেন। পরম ভক্তিমতি হইয়া তিনি প্রেমানন্দে মগ্ন রহিয়া দিবানিশি শালগ্রাম পূজায় রত থাকিতেন। তাঁহার গুণের কথা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। স্বয়ং শালগ্রাম তাঁহার প্রেমের অনুরোধে মুরলী-বদন, শ্রীরাধারমণ বিগ্রহ ধারণ করেন। তাহারই সামান্য বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনীয়।

একদা এক ধনিক তীর্থভ্রমণ-মানসে শ্রীবৃন্দাবনধামে আসিয়া অতীব শ্রদ্ধা-সহকারে সর্ব্ববিগ্রহের সেবাযোগ্য নানা ভোগ্য ও বস্ত্র-অলঙ্কারাদি প্রত্যেক বিগ্রহ-সমীপে নিবেদন করেন। সেই সঙ্গে গোপাল ভট্টের শালগ্রাম-সম্মুখেও তদনুরূপ বস্ত্র অলঙ্কারাদি নিবেদিত হইল।

অপূর্ব্ব বস্ত্র অলঙ্কারাদি দেখিয়া অতীব প্রেমরসের উদ্দীপন হওয়ায় গোস্বামীর ঘন ঘন ভাব-সমাধি হইতে লাগিল। প্রকৃতিস্থ হইলে এই বলিয়া খেদোক্তি করিতে লাগিলেন "অহো দুর্দ্দৈব! শালগ্রাম আমার হস্তপদাদি মনোরম অবয়ববিশিষ্ট হইলে এই সমস্ত বস্ত্র অলঙ্কারাদি তাঁহাকে পরাইলে কত সুশোভন হইত। পরম দুর্ভাগ্য আমার যে সেই অপরূপ প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি দেখিয়া প্রেমানন্দ-রসভোগে আমি বঞ্চিত থাকিলাম!"

এইরূপ খেদ করিতে করিতে অপূর্ণ মনোরথ লইয়া নিদ্রার আবেশে তাঁহার রাত্রি প্রভাত হইল। এদিকে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু

শালগ্রাম ঠাকুর রাত্রিমধ্যেই ত্রিভঙ্গিম, মুরলী-বদন, ভুবনমোহন স্বরূপে প্রকটিত হইয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন !!!

দরিদ্র যেমন মহানিধি লাভে পুলকে অধীর হয় প্রভাতে উঠিয়াই গোস্বামী মহাশয় অভীষ্ট দেবতার প্রেমঘনমূর্ত্তি, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-দর্শনে সেইরূপ প্রেমানন্দে মগ্ন হইলেন।

এখন বনিক-নিবেদিত বস্ত্র অলঙ্কারাদি মনের সাধে তাঁহাকে পরাইয়া গোস্বামীর ঐকান্তিক মনোরথ পূর্ণ হইল। অদ্যাপি সেই চিদানন্দ বিগ্রহ, বৃন্দাবনচন্দ্র "রাধারমণ" নামে, শ্রীবৃন্দাবন-ধামে বিরাজমান এবং গোপালভট্ট গোস্বামীর বংশধরেরা তাঁহার সেবা করিয়া আসিতেছেন !!!

লোকহিতের জন্য "হরিভক্তি বিলাস" নামে অপূর্ব্ব প্রেমভক্তি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পাদপদ্ম সতত আমাদের শুভবুদ্ধি ও প্রেমভক্তির সহায় হউক।

শ্রীশ্রীমধুপণ্ডিত ঠাকুরের চরিত্র।

শ্রীশ্রীমধুপণ্ডিত ঠাকুরের প্রেমভক্তি-বশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ প্রতিমারূপে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন; এই বিষয়ই এখানে সংক্ষেপে বর্ণনীয়।

শ্রীল মধুপণ্ডিত কৃষ্ণপ্রেমাবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন শ্রীবৃন্দাবন-ধামে উপনীত হইয়া চতুর্দ্দিকে পাগলের মত উৎকণ্ঠিত মনে বনে বনে প্রতি লতাকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করিতে থাকেন। শেষে দর্শন না পাইয়া বিরহকাতর হইয়া যমুনার তীরে বংশীবটের তলায় অনাহারে ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ হেন কালে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া স্বয়ং "গোপীনাথ বিগ্রহধারী" হইয়া নবঘন-নিন্দিত, ত্রিভঙ্গিম রূপে বংশীবট-সমীপে প্রিয়ভক্ত শ্রীমধুপণ্ডিতের দৃষ্টিগোচর হইলেন।

পণ্ডিত মহাশয় ইহা দেখিবামাত্র চমকিয়া উঠিলেন ও দ্রুততর ধাবিত হইয়া "গোপীনাথ বিগ্রহ" কোলে তুলিয়া লইলেন। তস্কর যেমন রত্ন পাইয়া বিঘ্ন-আশঙ্কায় ছুটিয়া পালায় তিনিও সেইরূপ "গোপীনাথ বিগ্রহরূপ" মহানিধি লুকাইবার স্থানের জন্য ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিলেন।

শেষে যমুনার তীরে কেশীঘাটের নিকট এক নিভৃত স্থানে সেই বিগ্রহ রাখিয়া প্রেমভাবাবেশে তাঁহার সেবা করিতে থাকেন।

কালক্রমে এক পরম সুধীর, ভক্তচূড়ামণি, কোনও ভাগ্যবান্ সেই বিগ্রহের জন্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাঁহার সুচারুভাবে সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

এখনও শ্রীবৃন্দাবন-ধামে সেই "গোপীনাথ বিগ্রহ" বিরাজমান!

এ হেন মহিমামণ্ডিত ভক্তচূড়ামণি শ্রীমধুপণ্ডিতের পাদপদ্মে আমাদের মতি চিরকাল স্থির থাকুক্।

শ্রীশ্রীবামদেবজীর চরিত্র।

(ক) সাধু বামদেব "ছিপিকর্ম্ম" অবলম্বন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণে মতি রাখিয়া কালাতিপাত করেন। একমাত্র বাল-বিধবা কন্যা ছাড়া তাঁহার আর কেহ সংসারে ছিল না। এই বিধবা কন্যার মুখ চাহিয়াই তিনি নিতান্ত দুঃখিত মনে সংসারে থাকিয়াই কৃষ্ণ-আরাধনা করিতেন।

সযত্নে ভক্তিতত্ত্ব শিখাইয়া শ্রীবিগ্রহের সেবা-পরিচর্য্যায় তিনি কন্যাকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার সেবা-পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে বর দিতে চাহিলেন।

অল্পবুদ্ধি, মূঢ়া কন্যা সঙ্গিনীদিগের পুত্র-কন্যা দেখিয়া নিজেও পুত্র-কামনা করিলেন।

শ্রীভগবৎ-বিগ্রহ তদনুযায়ী সুপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন—"আমি বড় মুগ্ধ হইয়া তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি—বিনা পুরুষ-সংসর্গে তোমার কৃষ্ণভক্ত-চূড়ামণি, লোকপাবন পুত্রের মদংশে আবির্ভাব হউক।"

তদনুযায়ী বিধবা কন্যার কালক্রমে গর্ভসঞ্চার হইল।

লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল—ভক্তচূড়ামণি বাম-দেবের মাথা লোকলজ্জায় অবনত হইল। তিনি লজ্জায় ঠাকুরের শরণাপন্ন হইয়া বলিলেন "লজ্জা-নিবারণ! আমার ভাগ্যে তুমি যে লজ্জাবর্দ্ধন করিলে—এই কি তোমার মহিমার যোগ্য !!! ভাল ঠাকুর! তুমি তোমার মহিমা লইয়া থাকো—আমার অপমান-রাশি মাথায় লইয়া তোমাকে আজ আমি নমস্কার করিয়া আমার কন্যা-কলুষিত গৃহ হইতে সকাতরে বিদায় ভিক্ষা করি"।

বাস্তবতঃ কলঙ্কিনী কন্যাকে শ্রীবিগ্রহ-সমীপে সমর্পণ করিয়া তিনি গৃহত্যাগী হইতে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সঙ্কল্প করিয়া খেদ করিতে করিতে **বামদেব** কাতর হইয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। নিদ্রাযোগে শ্রীবিগ্রহ **বামদেবকে** স্বপ্নে বলিলেন "বৎস বামদেব! তুমি চিন্তা পরিহার কর—তোমার কন্যা কলঙ্কিনী নহে; আমার বরে মদংশে তাহার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে। পরম কৃষ্ণভক্ত, লোকপাবন দৌহিত্র তোমার মুখ উজ্জ্বল করিবে। তাহার "**নামদেব**" নাম রাখিও। আমার মহিমায় তোমার সম্মান কিছুমাত্র খর্ব্ব হইবে না।"

কালক্রমে মহাকৃষ্ণভক্ত **নামদেবের** জন্ম হইল। বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার **কৃষ্ণাবেশ** দেখা গেল। অন্যান্য বালক যখন বাল্যচেষ্টার ক্রীড়ায় নিমগ্ন, **নামদেব** তখন প্রেমানন্দ-রঙ্গমালা গলায় পরিয়া কৃষ্ণসেবারূপ ক্রীড়ায় বিহার করিতেন!

শিশু **নামদেব** বাল্যেই মাতামহস্থানে পুনঃপুনঃ চোখের জলে নিবেদন করেন "দাদা! আমাকে বিগ্রহসেবায় নিযুক্ত কর।" **বামদেব** বলেন "বাবা, এখন তুমি অতি শিশু; বড় হইলে বিগ্রহসেবার যোগ্য হইবে—এখন উদ্বেগ পরিহার কর।"

অনন্তর কালক্রমে একদিন হঠাৎ কোনও কার্য্য-উপলক্ষে **বামদেবকে** গ্রামান্তরে যাইতে হইল; কাজেই অগত্যা তিনি শিশু দৌহিত্রকে বলিলেন "বাবা **নামদেব**! আমি দুই তিন দিনের জন্য গ্রামান্তরে যাইতেছি—বিগ্রহসেবার জন্য আর তো ঘরে কেহ নাই; তুমিই বাবা, সামান্য দুগ্ধ নিবেদন করিয়া বিগ্রহসেবা করিবে—আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

শিশু **নামদেব** এই সুযোগ-লাভে পরমানন্দ লাভ করিলেন: অতি সদাচারে, নিজ হস্তে দুই সের দুগ্ধ আনিয়া জ্বাল

দিতে দিতে তিনি আত্মহারা হইলেন—মাতাকে তাঁহার চৈতন্য-বিধান করিতে হইল !! শেষে দুগ্ধ নামাইয়া "মিছিরির" গুঁড়া দিয়া সুমিষ্ট করিয়া পবিত্র পাত্রে উষ্ণ দুগ্ধ জুড়াইয়া বিগ্রহ-সমীপে নিবেদন করিয়া সম্মুখে বসিয়া **নামদেব** বলিলেন "প্রভু! শ্রীহস্তে তুলিয়া দুগ্ধ পান কর, আমি কৃতার্থ হই"। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিগ্রহকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া তিনি বলিলেন "একি প্রভু! দুগ্ধ-পানে বিরতি কেন? শুধু মৃদু হাসি মুখে দেখা যায়, কিন্তু পানে নিশ্চেষ্ট কেন? যদি স্বয়ং পান না কর, আমাকে বল—আমি স্বহস্তে শ্রীবদনে তুলিয়া ধরি।"

ইহাতেও কোনও উত্তর না পাইয়া বলিলেন "অহো! বুঝিয়াছি প্রভু, আমি সম্মুখে থাকিতে বুঝি পান করিবে না। আচ্ছা, আমি বাহিরে যাইতেছি প্রভু, শীঘ্র দুগ্ধ-পান শেষ করা চাই।"

বাহিরে গিয়া **নামদেব** খেদের সহিত ভাবিতে লাগিলেন "আমার সঙ্গে পরিচয় নাই বলিয়া বুঝি দুগ্ধপানে বিরতি!"

কিছুক্ষণ পরে ভাবিলেন "বুঝিবা এতক্ষণে দুগ্ধপান শেষ হইয়াছে"। এই ভাবিয়া দ্বারের বাহির হইতে উঁকি মারিয়া দেখেন—দুগ্ধভাণ্ড এখনও তেমনি পড়িয়া আছে। তখন ভাবিলেন—তবে বুঝি দুগ্ধে কোনও বিঘ্ন আছে। এই ভাবিয়া আবার নূতন পাত্রে অন্য দুগ্ধ নিবেদন করিয়া বলিলেন—"ঠাকুর! দাদার কাছে তুমি নিত্য সেবা কর, আর আমিই কি একমাত্র দোষী! আমি এই বসিলাম, যদি না পান কর, গলায় ছুরি মারিয়া আত্মহত্যা করিব, তোমাকে প্রাণিহত্যাপাপ লাগিবে।"

তথাপি বিগ্রহকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া বাস্তবিকই একখানি ছুরি লইয়া বুকের উপর বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইতেই শ্রীবিগ্রহ বামহস্তে ছুরিখান ধরিয়া ফেলিলেন এবং দক্ষিণ হস্তে দুগ্ধভাণ্ড উঠাইয়া

মৃদুমন্দ হাসিতে হাসিতে দুগ্ধপান করিলেন। ইহাতে শিশু **নামদেব** মহানন্দসাগরে ভাসিতে লাগিলেন এবং পানাবশিষ্ট দুগ্ধের প্রসাদ মাতামহের জন্য রাখিয়া দিলেন।

বামদেব ফিরিয়া আসিলে শিশু **নামদেবকে** সেবাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেই **নামদেব** পিতামহকে বলিলেন "ঠাকুরকে সেবা করাইয়া তোমার জন্য প্রসাদ রাখিয়াছি, পান কর"।

বামদেব পাত্রে কিঞ্চিৎ-মাত্র দুগ্ধ দেখিয়া বলিলেন "**নাম-দেব**! দুগ্ধ আপনি খাইয়া "ঠাকুর খাইয়াছেন" মিথ্যা বলিলে? বিগ্রহ কি কখনও নিজহস্তে তুলিয়া সেবা করেন?"

নামদেব বলিলেন "দাদা, সে কি কথা! তোমার শপথ! আমি মিথ্যা বলি নাই। প্রথমে শ্রীবিগ্রহ পান করিতে নিশ্চেষ্ট থাকায় ছুরিকাহস্তে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইলে প্রভু আমাকে নিবৃত্ত করিয়া স্বহস্তে দুগ্ধপান করিয়াছেন।"

বামদেব ইহাতে অতি আশ্চর্য্য গণিয়া পুনরায় সন্দেহ করায় শিশু "নামদেব" শ্রীবিগ্রহের স্বহস্তে দুগ্ধপান-ব্যাপার পিতামহকে প্রত্যক্ষ করাইলেন !!!

বামদেবের নিকট সাক্ষাৎ শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনের যাহা অপেক্ষা ছিল শিশু নামদেব-সুসঙ্গে তাহা পূর্ণ হইল। **বামদেব** ইহাতে চমৎকার গণিয়া আপনাকে সামান্য জ্ঞান করিয়া শিশু নামদেবের চরণে ধরিয়া বহু প্রণতি করিলেন এবং নিত্য শ্রীবিগ্রহের চৈতন্যময় শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে প্রেমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।

(খ) কালক্রমে **নামদেব** শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন এবং নানা অলৌকিক লীলা তাঁহার জীবনে প্রকট হইতে লাগিল। এই সমস্ত অলৌকিক লীলার কথা লোকমুখে ম্লেচ্ছ **বাদসাহের** কর্ণগোচর হওয়াতে তিনি **নামদেবকে**

ডাকাইয়া লইয়া গেলেন ও রহস্য করিয়া বলিলেন "লোকমুখে তোমার নানা অলৌকিক লীলার কথা শুনিতেছি—আমারও কিছু দেখিবার কৌতূহল হইয়াছে।"

নামদেব বলিলেন "সামান্য ছিপিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করি; অলৌকিক লীলা আমাতে কিরূপে সম্ভব-পর?" ইহাতে **বাদসাহ** ক্রোধপরবশ হইয়া **নামদেবকে** কারাগারে বন্দী করিয়া দুই চারি দিন পরে আবার অলৌকিক লীলা-দর্শনের অভিলাষ **নামদেব**-সমীপে জানাইলেন; কিন্তু কৃষ্ণভক্ত, সাধু **নামদেব** আপনার দৈন্যজ্ঞাপন ভিন্ন কদাচ মহিমা প্রকাশ না করিয়া কারাগারে নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণ-আরাধনায় দিনপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, দৈবযোগে একদিন কারাগারের বাহিরে এক গাভী-বৎস মৃত্যুমুখে পতিত হইলে গাভীটী "হাম্বা হাম্বা" রবে ক্রন্দন করিতে থাকে। সেই সময়ে **বাদসাহ** সেই পথে যাইতে যাইতে এই দৃশ্য দেখিয়া **নামদেবকে** বলেন "তোমাদের শাস্ত্র-অনুযায়ী গোজাতি তোমাদের পূজার্হ—দেখ, এই গাভী মৃত বৎসের শোকে ফুকারিয়া ক্রন্দন করিতেছে; ধার্ম্মিক-প্রবর তুমি এই মৃতবৎসের জীবনীসঞ্চার-পূর্ব্বক গাভীর মনস্তাপ নিবারণ কর—ইহাতে তোমার ধর্ম্মের জয় হইবে।"

বাদসাহের এই শ্লেষের কথা শুনিয়া এবং সম্মুখে গাভীর এই করুণ অবস্থা দেখিয়া সাধু **নামদেব** দয়ার্দ্র হইয়া "কৃষ্ণনাম" উচ্চারণ-পূর্ব্বক গাভীবৎসকে "তুড়ি" দিয়া উঠিতে আদেশ করিতেই মৃত বৎস উঠিয়াই মাতার দুগ্ধ পান করিতে লাগিল!

এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া **বাদসাহ** স্তম্ভিত হইয়া **নামদেবকে** কারামুক্ত করিয়া তাঁহাকে বহু প্রণিপাত-

পূর্ব্বক ধনসম্পত্তি দান করিতে উদ্যত হইলেন। **বাদসাহ** বলিলেন "সাধু! আমার অপরাধ মার্জ্জনা-পূর্ব্বক এই ধনসম্পত্তি গ্রহণ করিয়া আমাকে ধন্য করুন।"

নামদেব বলিলেন "রাজন্! আপনি জয়যুক্ত হউন—আমার ন্যায় উদাসীনের কাছে এই ধনসম্পত্তির কি প্রয়োজন আছে! সুযোগ্য দরিদ্রদিগকে ইহার দ্বারা তুষ্ট করিলেই আমি সুখী হইব।"

বাদসাহ এবং তাঁহার পারিষদবর্গ এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে সাধু **নামদেবকে** "ধন্য ধন্য" করিয়া বহু সম্মান-পূর্ব্বক বিদায় দিলেন।

(গ) সাধু **নামদেবের** আর একটী অপূর্ব্ব কাহিনী এই স্থানে বর্ণনীয়।

এক **বণিক** তাঁহার বাণিজ্যে অশেষ লাভ হওয়ায় সুপাত্র-বিচার করিয়া নানা রজত-কাঞ্চন বিতরণ করিতে করিতে সাধু **নামদেবের** মহিমার কথা শুনিয়া তাঁহাকে বহু সমাদরে আহ্বান-পূর্ব্বক সুবর্ণ-আদির দান গ্রহণ করিতে মিনতি করেন।

সাধু **নামদেব** পরদুঃখে সর্ব্বদা দুঃখিত, দুঃখীকে দান না করিয়া তাঁহার ন্যায় উদাসীনকে এই ধনরত্ন-দানের জন্য বণিকের উৎসাহ দেখিয়া তিনি বিচার করিলেন "হরিভক্তিবিহীন এই বণিক মূর্খের ন্যায় "উদাসীন সন্ন্যাসিগণকে" দান করিতে যত্নবান হইয়া আত্মশ্লাঘা মনে করিতেছে—দরিদ্র-নারায়ণদিগকে তুচ্ছ মনে করে—দানের প্রকৃত মর্ম্ম এই মূঢ় কিছুই জানে না; অতএব ইহাকে কিছু তত্ত্বকথা বুঝাইতে হইল।"

কাজেই, সাধু **নামদেব** এক তুলসীপত্রে **কৃষ্ণনাম** লিখিয়া লইলেন এবং **বণিককে** সবিনয়ে বলিলেন "এই

তুলসীপত্রের পরিমাণ-তুল্য স্বর্ণ-দান যদি করিতে পার, গ্রহণ করি—নচেৎ গ্রহণের অভিলাষ রাখি না।"

বণিক বলিলেন "তুলসীর সমতুল্য সামান্য দুই রতি স্বর্ণে আপনার কি অভাব পূর্ণ হইবে? ভাল, আপনারই অভিলাষ পূর্ণ হউক।"

এই বলিয়া তুলাদণ্ডের একদিকে কৃষ্ণনাম-লিখিত তুলসী-পত্র ও অন্যদিকে দুই রতি মাত্র স্বর্ণ দিতেই তুলসীপত্রের ভার অধিক হওয়ায় পুনরায় দুই রতি স্বর্ণ দেওয়া হইল; তথাপি তুলসীপত্র ভারী হওয়ায় ক্রমে ক্রমে পাঁচসের পরিমিত স্বর্ণ দেওয়া হইল!!

ইহাতেও তুলসীপত্র ভারী দেখিয়া বণিক হতবুদ্ধি হইয়া প্রমাদ গণিলেন; কিন্তু প্রতিশ্রুতিভঙ্গভয়ে গৃহে যত সুবর্ণ ছিল সমস্ত চাপাইলেন!! তাহাতেও তুলসী-পত্র ভারী দেখিয়া পুরস্ত্রীগণের সমস্ত অলঙ্কার চাপাইলেন!! তথাপি তুলসী-পত্রের ভার লঘুতর না হওয়ায় প্রতিবেশীদিগের গৃহে যাহা কিছু অলঙ্কার ছিল সমস্ত ধার করিয়া আনিয়া তুলাদণ্ডে চাপাইলেন!!!

এখনও তুলসীপত্রের ভারের সমভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য গণিয়া সাধু-নামদেবকে করযোড়ে প্রণিপাত-পূর্ব্বক বণিক বলিলেন "প্রভু! আপনার তুলসীপত্রের সমতুল্য সুবর্ণ পূরণ করিতে অসমর্থ হইলাম!!! ইহার রহস্য উদ্‌ঘাটন-পূর্ব্বক অধীনকে কৃতার্থ করুন্।"

সাধু নামদেব বলিলেন "ভাই! ত্রিজগতে কৃষ্ণ-নামের তুল্য কিছুই নাই জানিবে। এই তুলসী পত্র কৃষ্ণনামাঙ্কিত, অতএব এখন কৃষ্ণনামের গুরুত্ব অবধারণ কর। লোকে অভিমানভরে বড় বড় কর্ম্মের

অনুষ্ঠান করিয়া চিত্তপ্রসাদ লাভের অভিলাষ করে !! কিন্তু "কৃষ্ণ-নামরূপ সিন্ধুর কাছে সমস্তই যে বিন্দুর সমান" মূঢ়মতি তাহারা "সে কথা" জানে না। "**শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রভু, জীব তাঁহার** নিত্যদাস" এ কথা মনে রাখিবে। বহুভাগ্যে সাধু-সঙ্গতিফলে জীবের দুর্ম্মতির নাশ হইলে এই তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। অতএব ভাই, সর্ব্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া একান্ত মনে সংসারতাপ-নাশন **কৃষ্ণপদ** ভজনা কর—**হরিনামের হার** গলায় ধারণ কর—অন্য গণ্ডগোল দূরে পরিহার কর। তুমি তো ভাই, কৃষ্ণনাম-মহিমার যৎকিঞ্চিৎ দেখিলে, পাঁচ মণ সুবর্ণও কৃষ্ণনামাঙ্কিত তুলসী-পত্রের কাছে লঘু হইল! অধিক কি বলিব ভাই, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড চাপাইলেও এই **মহানামাঙ্কিত পত্রের** কোটি অংশের **একাংশেরও** তুল্য হয় না !!!

এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া **বণিকের** মন একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া কৃষ্ণধ্যানপরায়ণ হইল !! সাধু **নামদেবের** শ্রীচরণ-কৃপায় **বণিক** বিষয়বিরক্ত হইয়া পরম বৈষ্ণব হইয়া ধন্য হইলেন।

ক্ষণমাত্র সাধুসঙ্গের গুণে, বহু ভাগ্য-ফলে কৃষ্ণতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। বৈষ্ণব-দাসানুদাসের শ্রীচরণকৃপায় আমাদের হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের মর্ম্ম স্ফুরিত হউক।

শ্রীমতী করমা বাইজীর চরিত্র।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ভক্ত, মাড়োয়ার-দেশীয় **শ্রীমতী করমা-বাইজীর** নাম ভক্ত-সমাজে সুপরিচিত। ভক্তিভরে খেচরান্ন পাক করিয়া তিনি শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে নিবেদন করিতেন; **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও** এই ভক্তিনিবেদিত খেচরান্ন পরম তৃপ্তির সহিত সেবা করিতেন; এই খেচরান্ন **আজও** স্বর্ণথালাতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বিগ্রহের সমীপে নিবেদিত হইয়া থাকে। এই খেচরান্ন-বৃত্তান্ত এই স্থানে সংক্ষেপে বর্ণনীয়; হরিভক্ত সাধুগণ এই অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত শুনিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীমতী করমা-বাইজী প্রভাতে উঠিয়াই ভক্তিভরে আদা, মরিচ, হিং প্রভৃতি মশলা ও প্রচুর ঘৃতসংযোগে মনের সুখে অমৃতনিন্দিত অন্ন রন্ধন করিতেন।

রন্ধনের বিলম্ব ঘটিলে "পাছে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব ক্ষুধায় কষ্ট পান" এই জন্য তিনি প্রভাতে উঠিয়া হস্তমুখ না ধুইয়াই আচার বিচারে ভ্রূক্ষেপশূন্যমনে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক রন্ধনে নিযুক্ত হইতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবও এই ভক্তিনিবেদিত খেচরান্ন-ভোজনের নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীমন্দির হইতে আসিয়া পরম তৃপ্তির সহিত সেবা করিতেন; অন্য কোনও ভোগে তাঁহার এরূপ তৃপ্তি হইত না !!!

কালক্রমে একদিন এক **বৈরাগী**-সাধু **শ্রীমতী-বাইজীর** শুভ চরিত্র শুনিয়া তাঁহার ভবনে অতিথিরূপে সমাগত হইলেন। তিনি অভ্যাগত হইয়া **শ্রীমতী বাইজীকে** প্রেমভক্তিমতী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা দেখিলেন বটে, কিন্তু **শ্রীমতী বাইজী** যে স্নানাদি না করিয়াই **শ্রীশ্রীজগন্নাথ-**

দেবের ভোগান্ন পাক করেন—ইহা দেখিয়া ক্ষুব্ধ চিত্তে শ্রীমতী বাইজীকে তিনি **আচার-পূর্ব্বক** কৃষ্ণসেবার প্রণালী উপদেশ করিলেন।

পরদিন তদনুযায়ী সদাচার-সম্পাদনান্তে ভোগান্ন নিবেদন করিতে বাইজীর বেলা প্রায় দুই প্রহর হইল; ইহাতে শ্রীমৎজগন্নাথ-দেবকে খাওয়াইতে অধিক বেলা হওয়ায় বাইজী বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন।

ওদিকে, **শ্রীমৎ জগন্নাথ ঠাকুর** খিচুড়ী খাইয়া তাড়াতাড়িতে আচমন না করিয়াই শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া গিয়া **লক্ষ্মীঠাকুরাণী** যেখানে পরিবেষন করিতেছেন সেখানে ভোজনে বসিলেন !!

প্রভুর হস্তে ও মুখে খিচুড়ী "লাগিয়া আছে" দেখিয়া সেবকগণ চমৎকৃত হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঠাকুর! কোন্ ভাগ্যবান্-গৃহে পদধূলি দিয়া "খিচুড়ী" খাইয়া তাঁহার মানবজীবন সফল করিলেন? বুঝিলাম ত্রিভুবনে তিনিই ধন্য !!"

অনন্তর, প্রভু পাণ্ডাদিগকে বলিলেন "দেখ ভক্তবৃন্দ! শ্রীমতী করমা বাইজী অতি ভক্তি-সহকারে পূর্ব্বাহ্নেই আমার জন্য অপূর্ব্ব খেচরান্ন পাক করিয়া রাখে—আমি তাহার ভবনে নিত্য উপস্থিত হইয়া যথাসময়ে তাহার ভক্তির নিবেদন অতীব তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকি। হঠাৎ **অমুক** বৈরাগীর **আচার-প্রণালীর** উপদেশ-অনুযায়ী তাহার রাঁধিতে বিলম্ব ঘটিতেছে—ইহাতে আমার ক্ষুধায় বড় কষ্ট হয় !!! তাহার ভক্তিনিবেদন **অগ্রে** সেবা না করিয়া শ্রীমন্দিরে আমি আসিতে পারি না, অথচ লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর পরিবেষিত ভোগান্ন না খাইলেও নয়—এই জন্য ছুটাছুটি করিতেও বড় কষ্ট হয় !!! তোমরা গিয়া স্বয়ং **শ্রীমতী বাইজীকে** বল "আমার আচার-বিচারে প্রয়োজন নাই";

"পূর্ব্বে যেরূপ ভোগ লাগাইত **সেইরূপ ভোগই** আমার **বাঞ্ছনীয়।**" এই জন্যই শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ধামের মহাপ্রসাদে উচ্ছিষ্ট বিচার নাই !!

অহো! কি আশ্চর্য্য দেখ! শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে যাঁহার প্রীতি তাঁহার **মহিমা** বেদবিধিরও অবিদিত না হইলে এ হেন অঘটনের সংঘটন কিরূপে সম্ভবপর !!!

পাণ্ডাগণ প্রভুর আদেশ শুনিতেই **তটস্থ** হইয়া **শ্রীমতী বাইজীর** স্থানে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে **বাইজী** মহানন্দ-সাগরে ভাসমান হইয়া পূর্ব্ববৎ প্রাতে উঠিয়াই খেচরান্ন পাক করিয়া প্রেমানন্দে **শ্রীমৎ জগন্নাথ দেবকে** ভোগ দিতে থাকেন।

যে **বৈরাগী** শ্রীমতী **বাইজীকে** আচার-প্রণালীর উপদেশ করেন, তিনি এই সব বৃত্তান্ত **পাণ্ডা**-মুখে শুনিয়া ভয়ে কম্পিত হইয়া **বাইজীর** নিকট গমন করিয়া করযোড়ে দণ্ডবৎ হইয়া প্রভুর সেবাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। ভক্তের মহিমা প্রকাশিত করিবার জন্যই এই **বৈরাগী**-চরিত্র প্রভুর এক লীলা-রঙ্গ মাত্র: কাজেই, **বৈরাগী-সাধুর** সেবাপরাধ প্রভু ক্ষমা করিলেন।

এই **করমা বাইজীর** স্মরণার্থে এখনও তাঁহার নামে স্বর্ণথালীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে খেচরান্নের ভোগ দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রীকরমা বাইজী কলিকলুষমগ্ন আমাদের ন্যায় জীবের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন; তাঁহার শ্রীচরণ আমাদের মস্তকের ভূষণ হউক।

শ্রীশ্রীঅর্জ্জুন মিশ্রের চরিত্র।

মহান্, উদারচেতা, গম্ভীর-প্রকৃতি ও সুপণ্ডিত, নির্ম্মৎসর ও শান্ত-শিষ্ট এবং ভগবৎগতপ্রাণ, পরম সাধু **অর্জ্জুন মিশ্র** সর্ব্বদা বৈরাগ্যবুদ্ধিতে সমাহিত থাকিয়া ভিক্ষা-মাত্র উপজীবিকার উপর নির্ভর করিয়া পত্নীসমভিব্যাহারে শ্রীশ্রীপুরুষোত্তমধামে বাস করিতেন। তথায় তিনি সর্ব্বদাই শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার অনুশীলনে বিলাস করিতেন এবং এই মহৎ গীতামৃতের টীকা লিখিতে নিবিষ্ট-চিত্ত থাকিতেন। শ্রীমৎ অর্জ্জুন মিশ্রের এই প্রসিদ্ধ গীতার টীকা এখনও পণ্ডিত-সমাজে অতি আদরের বস্তু। তাঁহার বিষয়েই অলৌকিক একটী বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনীয়।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার টীকা লিখিতে লিখিতে নবম অধ্যায়ের দ্বাবিংশ শ্লোকের "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" (যোগ অর্থাৎ ধনাদিলাভ এবং ক্ষেম অর্থাৎ মোক্ষ, বহন করিয়া থাকি) এই পংক্তি-বিচারে তাঁহার মনে সন্দেহ ঘটে। এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "যাহারা অনন্য-কাম হইয়া আমার চিন্তায় মগ্ন থাকে, আমাতে নিত্যযুক্ত এইরূপ ভক্তদিগের 'ধনাদিলাভ' এবং 'মোক্ষ' **আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে** বহন করিয়া থাকি।"

"**প্রত্যক্ষভাবে** তিনি বহণ করেন" ইহা অসম্ভব মনে করিয়া "**পরোক্ষভাবে**" এই অর্থানুযায়ী পদ বসাইয়া গীতার মৌলিক পাঠ তিনি লেখনীর দ্বারা আঁচড়াইয়া কাটিলেন।

কিন্তু "ভাগবত গ্রন্থ" শ্রীশ্রীভগবানেরই "সাক্ষাৎ দেহ-স্বরূপ"; কাজেই, গীতার মৌলিক পাঠে লেখনীর আঁচড় লাগিলে সেই

আঘাতে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অঙ্গ বিক্ষত হইল! এই তত্ত্ব শ্রীঅর্জ্জুনমিশ্রকে বুঝাইবার জন্য লীলাময় হঠাৎ দারুণ বাতবৃষ্টির আবির্ভাব করিলেন।

এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে ভিক্ষাজীবী অর্জ্জুন-মিশ্র গৃহের বাহির হইতে না পরিয়া একদিন সস্ত্রীক উপবাসী থাকিলেন। পরদিন দুর্য্যোগের সামান্য শান্তি দেখিয়া সেই অবসরে তিনি ভিক্ষার চেষ্টায় বাটীর বাহির হইলেন। ওদিকে, কিছুদূর যাইতেই আবার লীলাময়ের লীলায় ঝড়বৃষ্টির আবির্ভাব হইল এবং "মিশ্র" ঠাকুর কোথাও ভিক্ষার জন্য ঘুরিতে পারিলেন না; কোনও আচ্ছাদিত ভগ্নকুটীরে বহুকষ্টে আশ্রয় লইলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম 'দুই ভাই" ব্রাহ্মণ-বালকের বেশে স্কন্ধে প্রসাদের ভার বহন করিয়া রক্তাক্ত-কলেবরে রোদন করিতে করিতে "মিশ্রজীর" ভবনে উপস্থিত হইয়া "মিশ্রঠাকুরাণীকে" বলিলেন "মা! মিশ্রজী এই প্রসাদ পাঠাইয়াছেন, গ্রহণ করুন্।"

এই কথায় "মিশ্র-ঠাকুরাণী" আশ্চর্য্য গণিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা! এত প্রসাদ তিনি কোথায় পাইলেন? সুকুমার, কোমলাঙ্গ তোমাদের স্কন্ধে এই গুরুভার চাপাইতে তাঁহার মনে কি ব্যথা লাগিল না! তোমাদের অঙ্গে রক্তধারা বহিতেছে!! তোমরা যন্ত্রণায় রোদন করিতেছ! আহা মরি! কে হেন নিষ্ঠুর সে, যে এমন সোণার কোমল অঙ্গে আঘাত করিয়াছে? আর, তোমাদের বাসই বা কোথায় এবং "তোমাদের পিতামাতাই বা এই দুর্য্যোগে তোমাদেরকে ঘরের বাহিরে কিরূপে ছাড়িয়া দিয়াছেন" সমস্ত আমাকে বল তো বাবা! আমার মন তোমাদের এই দুঃখ দেখিয়া বড় কাতর ও অবসন্ন হইয়াছে—কি দিলে তোমাদের কষ্টের লাঘব [illegible]বা?

ব্রাহ্মণবালকের ছদ্মরূপে লীলাময় শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-বলরাম তখন কোমল-প্রাণা, ভক্তিমতী মিশ্রঠাকুরাণীকে বলিলেন "মা! জীবের দুঃখে চিরকাতর-প্রাণ মাতাপিতার আমরাই দুই "সহোদর" সন্তান, কেবল ভার-বহন করাই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; ভারবহন-কার্য্যে আমাদের সুযোগদুর্য্যোগ-বিচারে অধিকার নাই; নিত্যকর্ম্মের এই ব্রত-অনুযায়ী আজ মিশ্রঠাকুরের ভার-বহনে নিযুক্ত হইয়াছি; কিন্তু, বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়—অনশনে ক্লান্ত ও মতিভ্রান্ত হইয়া "মিশ্র-ঠাকুরই" তীক্ষ্ণ লৌহ-শলাকাদ্বারা আমাদের অঙ্গে আঘাত করিয়াছেন—এ কথা আপনার ন্যায় কোমল-প্রাণা সাধ্বীর পক্ষে বিশ্বাস করা সুকঠিন; তিনি ফিরিলে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সত্যমিথ্যা বুঝিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া লীলাময় "শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম" প্রসাদের ভার ভূমিতে নামাইয়া দিয়াই পলাইয়া গেলেন!! এদিকে, মিশ্রঠাকুরাণী বালক দুইটীর সেবা-শুশ্রূষার সুযোগ না পাইয়া সকাতরে ভূমিতে পড়িয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, "মিশ্রঠাকুর" বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রোদন-পরায়ণা "ঠাকুরাণীর" মুখে এই সমস্ত বৃত্তান্তের মধ্যে যেই প্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় শুনিলেন "তথাকথিত বালক দুইটী অপূর্ব্বস্বরূপ, সুকুমার-দেহ, গৌরকৃষ্ণবর্ণ এবং সুবর্ণকুণ্ডলধারী" তখনই সুবোধ পণ্ডিত গীতা-পাঠ-খণ্ডনের মর্ম্ম বুঝিয়া "অহো! আমি সত্য সত্যই ভগবৎ-অঙ্গে আঘাত করিয়াছি" এই বলিতে বলিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন!

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর ব্রাহ্মণীকে প্রশংসা করিয়া বলিলেন "স্বয়ং শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম দেব আমাদের গৃহে আসিলেন! তুমিই ধন্য যে তাঁহাদের দর্শন পাইলে; আমার ভাগ্যেই সে শুভযোগ ঘটিল না!!

তদনন্তর "মিশ্রঠাকুর" তাঁহার লিখিত গীতার টীকায় "বহাম্যহং" অর্থাৎ "আমিই স্বয়ং প্রত্যক্ষভাবে বহন করি" এই মৌলিক গীতার পাঠ পুনঃ স্থাপিত করিলেন এবং কৃতাপরাধ-ক্ষমার জন্য বহু স্তব-আরাধনা করিলে ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরামদেব তাঁহার উপর কৃপাপরবশ হইয়া তাঁহাকে স্বরূপ দর্শন করাইয়া ধন্য করিলেন।

মিশ্রঠাকুর ও ঠাকুরাণীর শ্রীচরণ-আশীর্ব্বাদে সর্ব্বদা শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম ও ভাগবত গ্রন্থে আমাদের শুদ্ধা মতি হউক।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামীর চরিত্র।

অতীব ভক্তিপরায়ণ, নিষ্কাম ও নির্মোহ, সুপণ্ডিত ও সর্ব্ব-গুণাকর **শ্রীমৎ বিষ্ণুপুরী গোস্বামী** ভুক্তি-মুক্তি আদি অগ্রাহ্য করিয়া ৺কাশীধামে প্রেমানন্দে বিহার করিতেন এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের বহুল আলোচনায় নিমগ্ন থাকিতেন। অবশেষে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতরূপ "অমৃতসাগর" মন্থন করিয়া পরাৎপর সুধা-স্বরূপিনী **ভক্তিরত্নাবলী** নামে প্রসিদ্ধ ভক্তিগ্রন্থের প্রণয়ন করেন। অদ্যাপি বৈষ্ণব-ভক্তসমাজে পরম সমাদরের সহিত এই অমূল্য গ্রন্থের অধ্যয়ন হইয়া থাকে। কৃষ্ণপ্রেমধনে পরম ভাগ্যবান্ এই গোস্বামী-ঠাকুরের ভক্তিমাহাত্ম্য-বিষয়ে একটী বৃত্তান্ত এখানে বর্ণনীয়।

ভক্তহৃদয়বিহারী **শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেব** পুরুষোত্তমধামে থাকিয়া একদিন সেবক পাণ্ডাদিগকে আদেশ করেন "দেখ বাবা! তোমারা ৺কাশীধামে গিয়া শ্রীমৎবিষ্ণুপুরী-গোস্বামী-নামে আমার এক ভক্তকে খুঁজিয়া বাহির করিবে ও তাহাকে বলিবে সে যে ভুক্তি-মুক্তির আশে ৺কাশীধামে বাস করিতেছে—এ তো খুব ভাল কথা, কিন্তু অকিঞ্চন "বনচারী" আমার তাহাকে কিছুই দিবার না থাকিলেও তাহাকে দেখিবার "বাসনা" আমার হৃদয়ে অতীব বলবতী হইয়াছে।" শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ইহা প্রেমের একটী রঙ্গমাত্র!!!

অনন্তর, ঠাকুর "শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরী" পাণ্ডা-মুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের এই সমস্ত রহস্যময় কৃপাবাক্য শুনিয়া পরম আনন্দভরে বলিলেন— "ভুক্তির কথা তো বহু দূরে, **মুক্তিচতুষ্টয়**—এমন কি বৈকুণ্ঠেরও কোনো সুখ আমি গণনা করি না, যেহেতু শুনিলাম

"শ্রীশ্রীজগন্নাথ কৃষ্ণসুন্দর" আমার ন্যায় অধমের কথা স্মরণ করিয়াছেন। "তিনি কে এবং তাঁহার ভক্তই বা কি" কিছুই বুঝিতে পারিলাম না—আমি কাশী, গয়া মথুরার কি জানি—কেবল তাঁহারই নামরত্নমালা হৃদয়ে ধারণ করিয়া যেখানে সেখানে পরমানন্দে বিহার করিয়া থাকি মনে শুধু ভয় হয়—বুঝি বা ত্রিজগতের লোভনীয় এই মহানিধি কখন্ হারাইয়া ফেলি !!! "আমার হৃদয়-বিহারী আমাকে ডাকিয়াছেন" ইহা তো আমার পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু, শুনিয়া ক্ষুব্ধ হইলাম "জগৎ-সর্ব্বস্ব" তিনি আপনাকে "অকিঞ্চন বনচারী" বলিয়া আমার সহিত রঙ্গ করিয়াছেন !!! অভিমান-ভরে বলিলেন, ভাল, তাঁহাকে বলিবে, তিনি যে ভক্তের হৃদয়-কাননে বিচরণ করিয়া থাকেন ইহা তো বহুকালের সত্য কথা—আর, "একমাত্র প্রেমরূপ পরমধন তাঁহার যাহা ছিল" তাহাও তো গোপিকার কাছে বাঁধা আছে, কাজেই, এখন তিনি অকিঞ্চন ছাড়া আর কি ? এই "প্রেমধন" ছাড়া আর কিছুতেই তাঁহার কামনা নাই—তাই, "তিনি যে অকিঞ্চন" এ কথাও বড় সত্য !!! তবু, এখনও তাঁহার একমাত্র অক্ষয় ও অব্যয় যে "রূপরাশি" আছে তাহাই দেখিবার আশা রাখিলাম। কিন্তু কৃপা করিয়া যখন তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে আরও একটু দয়া করিয়া তাঁহার শ্রীঅঙ্গের একগাছি মালা পাঠাইতে বলিবে—তবেই বুঝিব—এই দাসের প্রতি তাঁহার পূর্ণ কৃপা হইয়াছে এবং তাঁহার শ্রীচরণ পাইবার ভরসা রাখা চলে।"

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামীর এই সমস্ত কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব গোস্বামী-সমীপে শ্রীঅঙ্গের একগাছি রত্ন-মালা পাঠাইয়া পরিবর্ত্তে তাঁহার নিকট হইতেও কিছু চাহিয়া আনিতে সেবকগণকে আদেশ করিলেন।

সুবোধ, পণ্ডিত গোস্বামী-ঠাকুর "শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের" এই আদেশের মর্ম্ম বুঝিয়া অপার আনন্দের সহিত স্বরচিত "ভক্তিরত্নাবলী-হার" লইয়া পুরুষোত্তমধামে উপনীত হইলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীচরণে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ নিবেদন করিলেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীচরণ-দর্শনে পরম প্রেমাবেশে তিনি এই "ভক্তি-রত্নাবলী" প্রভুর সম্মুখে অশেষ অনুরাগভরে পাঠ করিয়া শুনাইলেন এবং প্রভুর প্রেমামৃতসাগরে ভাসমান হইলেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রেমসিন্ধুর এক বিন্দু-মাত্র শ্রীশ্রীবিষ্ণুপুরী গোস্বামীর শ্রীচরণ-কৃপায় আমাদের সংসার-তাপ-নাশের জন্য লভ্য হউক।

শ্রীশ্রীজগন্নাথী মাধবদাসজীর চরিত্র।

(ক) শ্রীশ্রীজগন্নাথী মাধবদাসজী কৃষ্ণানুরাগে স্ত্রীপুত্র, ধন-সম্পত্তি এবং সমস্ত সুখবাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া একান্ত মনে নীল-গিরিধামে, সিন্ধু-তীরে বাস করিতেন; শেষে উদর-পরিপূরণার্থে ভিক্ষাবৃত্তিও পরিত্যাগ করিলেন। এই ভাবে তিনদিন উপবাসের পর ভক্তবৎসল শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেব উৎকণ্ঠিত হইয়া লক্ষ্মী-ঠাকুরাণীর দ্বারা তাঁহার জন্য রাত্রিতে শয়নের কালে সুবর্ণ-থালীতে মহাপ্রসাদ দিয়া অন্তর্হিত হইলে সাধু বুঝিলেন "ইহা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবেরই লীলা !!!" কাজেই, মহাপ্রসাদ প্রেমানন্দে সেবা করিবার পর থালীখানি ধুইয়া নিকটেই দ্বারের বাহিরে রাখিলেন।

অনন্তর, প্রাতঃকালে পাণ্ডাগণ স্বর্ণথালী না পাইয়া চতুর্দ্দিকে খুঁজিতে খুঁজিতে মাধবদাসের সমীপে স্বর্ণথালী দেখিতে পাইয়া তাঁহাকেই চোর মনে করিয়া বেত্রাঘাতের দণ্ড দিলেন। সাধুর পৃষ্ঠে যে সমস্ত বেত্রাঘাতের বর্ষণ হইল, বাস্তবিকই, সে সমস্ত প্রভু "জগন্নাথ-দেবই" সহ্য করিলেন!! সে জন্য, "সাধুও" **তাঁহার** শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ধীরভাবে সমস্ত নিগ্রহ বহন করিতে পারিলেন।

ওদিকে, রাত্রিকালে প্রভু জগন্নাথ "সেবক পাণ্ডাদিগকে" স্বপ্নযোগে বলিলেন "দেখ! আমার একান্ত ভক্ত, "সাধু মাধবদাসকে" তোমরা বিনাদোষে চোরের শাস্তি দিলে—উহাকে যে তোমরা এত প্রহার করিলে "সে সমস্ত" আমাকেই বাজিয়াছে—এই দেখ, বেত্রাঘাতে আমার পিঠ ফুলিয়া রহিয়াছে। উপবাসী ভক্তকে আমার আমিই স্বর্ণ-থালীতে অন্ন পরিবেষণ করাইয়াছি—আমি আদেশ করিতেছি, এখন হইতে তোমরা অতি সাবধানে আমার এই ভক্তের সহিত ব্যবহার করিবে।"

পাণ্ডাগণ এই "স্বপ্ন" দেখিয়া প্রাতঃকালে উঠিয়া শিরে করাঘাত-পূর্ব্বক "হাহাকার" করিতে লাগিলেন এবং ভক্ত মাধব-দাসের সমীপে গিয়া তাঁহাকে বহু সমাদরে আপ্যায়িত করিলেন ও দণ্ডবৎ হইয়া কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন ; উদাসীন মাধব-দাসও তাঁহাদের সেবা-শুশ্রূষায় সকল দুঃখ ভুলিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে মহান্ আনন্দভরে প্রভু জগন্নাথদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোনো অসুবিধা বা সেবাপরাধ যাহাতে না ঘটে সে বিষয়ে পাণ্ডাগণ সেই হইতে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন।

(খ) হঠাৎ একদিন সাধু মাধব-দাস আমাশয়-রোগে কাতর হইয়া সমুদ্রতীরে বালুকারাশির উপর এক স্থানে পড়িয়া ছিলেন— পান কিম্বা শৌচের জন্য সামান্য জল পর্য্যন্ত আনিবার সামর্থ্য তাঁহার নাই। ভক্তের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া গুণমণি, দয়ালু জগন্নাথ-দেব ছদ্মবেশে জলপাত্র লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সাগর হইতে তাঁহাকে জল আনিয়া দিলেন।

মাধবদাস ইহাতে কৃতজ্ঞতা-ভরে বলিলেন "কাঙ্গালের প্রতি তোমার এত দয়া! কে তুমি মহাপুরুষ, এত যে কষ্ট স্বীকার করিতে এলে?" তিনি বলিলেন "আমি স্বয়ং জগন্নাথ, তোমার দুঃখ দেখিয়া হাত ধোয়াইতে আসিয়াছি—এই জল আনিয়াছি, হাত ধোও।"

মাধব-দাস এই শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া উৎকণ্ঠার সহিত বলিলেন "প্রভু, কেন এই দাসের জন্য তুমি এমন অনুচিত কর্ম্মের আচরণ করিলে? রত্নসিংহাসনে তুমি চিরকাল অধিষ্ঠিত ; দেবতা-মানব সকলে ভৃত্যভাবে তোমার সেবা করে ; আমি নীচ কাঙ্গাল, কেন বৃথা আপন ঐশ্বর্য্য খর্ব্ব করিতে এখানে আসিলে প্রভু? লোকে একথা শুনিলে তোমাকে পরিহাস করিবে এবং লক্ষ্মীঠাকুরাণীও নিন্দা করিবেন ; যাও প্রভু, শীঘ্র মন্দিরে ফিরিয়া যাও।"

জগন্নাথ-দেব ইহাতে বলিলেন "দেখ ভক্ত মাধব! লোকলজ্জা, মান, ভয় সকলই সহ্য করিতে পারি—তোমার দুঃখ আমার প্রাণে সহ্য হয় না; তোমার এ হেন মলিন অবস্থা আমি দেখিতে পারিব না। ওঠো মাধব! শীঘ্র হাত ধোও।"

জগন্নাথ-দেবের কালবিলম্ব হইতেছে দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠায় "মাধবদাস" তৎক্ষণাৎ উঠিয়া হাত ধুইয়া বলিলেন—"এই নাও ঠাকুর, হাত ধুইয়াছি—শীঘ্র মন্দিরে ফিরিয়া যাও—আমার আর কোনো ব্যাধি নাই, ভাল করিয়া দেখিয়া যাও।"

পীড়াশান্তি সাধুর মোটেই লক্ষ্য নহে—পাছে প্রাণনাথ জগন্নাথ-দেবের লোকলজ্জা ও নিন্দাবাদ ঘটে এই ভয়ে "তিনি যে ব্যাধিশূন্য" এই স্তোকবাক্যেও "প্রভুকে" সান্ত্বনা দিয়া "মাধবদাস" তাঁহাকে ফিরাইতে উদ্যত হইলেন। শুদ্ধ মাধুর্য্যভাবাপন্ন, নিষ্কাম সাধুর প্রেমের রীতিই এইরূপ !!!

তদনন্তর প্রভু জগন্নাথ-দেব ভক্তবাৎসল্যের "এই লীলা" দেখাইয়া মাধবদাসের শরীরে পদ্মহস্ত বুলাইয়া শ্রীমন্দিরে ফিরিয়া গেলেন—মাধবাসও রোগমুক্ত হইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গেলেন ও একান্তমনে প্রভু জগন্নাথের প্রেমসাগরে নিমগ্ন রহিলেন।

(গ) একদিন প্রভু জগন্নাথদেবের "মাধব-দাসের" সহিত কিছু কৌতুক করিবার বাসনা হইল। তদনুযায়ী, তিনি মাধব-দাসকে বলিলেন "ওহে মাধব! আজ চল, সত্যবাদী গোপালের উদ্যানে গিয়া আমরা দুইজনে কাঁঠাল "চুরি" করিয়া খাই।" এই উদ্যান প্রভু জগন্নাথ দেবেরই উদ্যান; সেই জন্য, জগন্নাথ-বিগ্রহধারী স্বয়ং ননী-চোরা শ্লেষছলে গোপালকে "সত্যবাদী" বলিয়া কাঁঠাল চুরি করিবার অভিনব লীলার অভিলাষী হইলেন।

মাধব-দাস এই প্রস্তাবে স্বীকৃত না হওয়ায় প্রভু জগন্নাথ দেব

তাঁহাকে অতি নির্ব্বন্ধ-সহকারে টানিয়া উদ্যানে লইয়া গেলেন এবং একটী সুপক্ক কাঁঠাল গাছ হইতে পাড়িলেন। উভয়ে কাঁঠালটী ভাঙ্গিয়া খাইবার উপক্রম করিতেছেন এমন সময় মালীগণ "বাগানে চোর আসিয়াছে" বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য অনুধাবন করিতেই প্রভু জগন্নাথ-দেব অগ্রেই মাধব-দাসকে একাকী ফেলিয়া পলায়ন করিলেন !!

উদারচরিত মাধবদাস ইহাতে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সেইখানেই বসিয়া রহিলেন। ওদিকে মালীগণ তাঁহার মহিমা না জানিয়া তাঁহাকেই চোর মনে করিয়া কাঁঠালসহ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক জগন্নাথমন্দিরে পাণ্ডাগণের নিকট বিচারার্থ লইয়া চলিল।

"মাধবদাস" এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হইয়া মালীগণের সম্মুখে জগন্নাথ-দেবের নিন্দাবাদ করিয়া বলিলেন "দেখ মালীগণ! তোমরা আমাকে বৃথা চোর মনে করিয়াছ—প্রকৃত চোর "স্বয়ং জগন্নাথ" শঠতা করিয়া আমাকে টানিয়া আনিয়া এখন বন্ধনদশায় ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছেন—চল, তাঁহাকে দেখাইয়া দিব—তাঁহারই কাছ হইতে কাঁঠালের মূল্য লইবে—যদি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস না হয়, সঙ্গে আইস, কণ্টকবৃক্ষে তাঁহার পীতাম্বর আঁটকাইয়া আছে—দেখাইয়া দিব।

মালীগণ এই সমস্ত কথাকে প্রলাপবচন মনে করিয়া মাধবদাসকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল। পাণ্ডাগণ মাধবদাসকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন এবং পূর্ব্বাপর বৃত্তান্ত শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য গণিয়া তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিলেন। অবশেষে পাণ্ডাগণ জগন্নাথ-দেবের তুষ্টির নিমিত্ত ভারে ভারে কাঠাল, নারিকেল প্রভৃতি ফল আনাইলেন এবং সেই সঙ্গে **তাঁহার** শ্রীঅঙ্গের উত্তরীয়-খণ্ডও আনাইয়া প্রভুর সম্মুখে নিবেদন করিলেন। তৎক্ষণাৎ প্রভুর এই কৌতুকের কথা গ্রামে গ্রামে ছড়াইয়া পড়িল।

এদিকে মাধবদাস এই সমস্ত ঘটনায় হতবুদ্ধি হইয়া জগন্নাথ-সমীপে ক্ষুব্ধচিত্তে তাঁহার ভৎর্সনা করিতে করিতে বলিলেন—"ওহে ধৃষ্ট, দুষ্ট, শঠ, লম্পট, চোর! আপনি চুরি করিয়া আমাকে বন্ধনদশায় ফেলিয়া আসিলে!! আপনার স্বভাবের আর এই অভিনব লীলার প্রয়োজন কি আছে? ননীচোর, মনচোর বলিয়া তো তোমার নাম প্রসিদ্ধই আছে—এখন হইতে তোমার "কাঁঠাল-চোর" নামও প্রসিদ্ধ থাকিবে।"

ভক্তের এই সমস্ত ভৎর্সনা-বাণী শুনিয়া জগন্নাথ-দেব আনন্দ-উল্লাসে নিমগ্ন হইলেন।

সুমধুর গাঢ়প্রেমের আবেশে ভক্তহৃদয়ের এই সমস্ত ভৎর্সনা-বাণী সুমিষ্ট স্তব অপেক্ষাও উচ্চ বলিয়া পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া থাকেন!!!

(ঘ) ভক্ত মাধবদাস শ্রীবৃন্দাবনধামের নিধুবনে বঙ্কবিহারী-দর্শনে প্রেমানন্দে বিহার করিতে থাকেন। একদিন তিনি তথা হইতে ভাণ্ডীর-বনে এক উচ্চ স্তূপের নিম্নে কৃষ্ণনামরসে নিমগ্ন হইয়া পড়িয়া ছিলেন। সেই স্তূপের উপরে নিকৃষ্টস্বভাব, ভক্তিলেশশূন্য, ব্রহ্মচারিবেশে এক ঘোর বিষয়-মগ্ন জীব বাস করিত। তাহার কৃপণতার সীমা ছিল না।

তণ্ডুল, গোধূম, ঘৃত, গুড়, চিনি, ইত্যাদি দ্রব্য-সম্ভারে তাহার গৃহ পরিপূর্ণ থাকিত। অতিথি, বৈষ্ণব, অনাথ, আতুর কাহাকেও এক রতি পরিমাণও খাদ্য দান করিত না, বরং কেহ কিছু চাহিলে তাহাকে সে মারিতে যাইত! অথচ কার্পণ্যবশতঃ নিজেও কিছু খাইত না।

এদিকে মাধবদাস সেই স্তূপের নিম্নদেশে প্রেমানন্দে কৃষ্ণ-নামগানে নিমগ্ন ছিলেন। তাঁহার গান শুনিয়া সেই ব্রহ্মচারী

উপর হইতে চেঁচাইয়া কহিল "কে রে বেটা! বৃথা গোলমাল করিতেছিস্? এখনি দূর হ'য়ে যা'।" পুনঃ পুনঃ গালি শুনিয়াও সর্ব্বজ্ঞ মাধবদাস সেই স্থান ত্যাগ করিলেন না—ব্রহ্মচারীর স্বভাব হীন বুঝিয়া দয়ার সাগর সাধুর মনে তাহার উপকার করিবার প্রতিজ্ঞা জন্মিল—মনে মনে চিন্তা করিলেন "এই মূঢ় অভাজনের কিছু মঙ্গল করিব।"

এই ভাবিয়া সাধু মাধবদাস স্তূপের উপরে উঠিলেন ও ব্রহ্মচারীকে বলিলেন, "বাবা! আমি বড় ক্ষুধায় কাতর—কিছু খাদ্যদানে আমার অন্তরাত্মার তৃপ্তি সাধন কর।" যখন দেখিলেন ব্রহ্মচারীর দয়া হইল না তখন সাধু মাধবদাস সেই স্থান ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এদিকে প্রভু জগন্নাথের মায়ায় ব্রহ্মচারীর সমস্ত গৃহ-সামগ্রী কৃমিসঙ্কুল হইয়া উঠিল! এই দৃশ্য দেখিয়া ব্রহ্মচারী ব্যাকুল হইয়া ফুকারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মহাবেগে সাধুর পশ্চাদ্ধাবন করিল ও সাধু মাধবদাসের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহার চরণতলে পতিত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "মহাশয়! কেন বৃথা আমার সর্ব্বনাশ করিলে? আমার সঙ্গে আইস, আমার দ্রব্য-সামগ্রীর অর্দ্ধেক তোমাকে দিব—আমাকে দয়া করিয়া তোমার অভিশাপ হইতে রক্ষা কর—ঘোর কৃমিবিভীষিকা হইতে ত্রাণ কর—আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম।"

সাধু মাধবদাস স্মিত মুখে সবিনয়ে বলিলেন "দেখ বৎস! আমার কথা শুন—তোমার মঙ্গল হইবে।" তুমি একাকী বনচারী, পিতামাতা-স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তোমার কেহ নাই—তবে, অতিথি-বৈষ্ণবে বঞ্চিত রাখিয়া কাহার জন্য তোমার গৃহপূর্ণ খাদ্য-সামগ্রী সঞ্চিত করিয়া রাখ? কেন বৃথা বিষয়কূপে পঙ্কিল মনে বসিয়া বসিয়া

কালক্ষেপ কর? শুন শুন, আমার প্রাণগোবিন্দ, নয়নরঞ্জন কৃষ্ণ-ধনের শ্রীচরণ ভজনা কর।”

এইরূপ বলিতে বলিতে সাধু মাধবদাস ব্রহ্মচারীকে আধ্যাত্মিক যোগ-সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন ও বিষয়ক্রমে তাহার মনে বৈরাগ্য-বুদ্ধি জন্মাইয়া শেষে পরমরত্ন “ভক্তিতত্ত্ব” তাহাকে বুঝাইলেন—শেষে তাহার মনে কৃষ্ণপ্রেমের সঞ্চার করিলেন। এই সমস্ত ভক্তিতত্ত্ব শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মচারীর মন ফিরিয়া গেল ও তিনি সাধুসঙ্গ-রূপ কল্পবৃক্ষের অমৃতফলের অধিকারী হইলেন—কৃষ্ণধনে তাঁহার অনুরাগ জন্মিল ও তখন হইতে তিনি তদ্গতমানস হইয়া সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সাধু মাধবদাসের সহিত প্রেমানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন—তাঁহার বিষয়-জ্বালার অবসান হইল।

সর্ব্বশাস্ত্রে সাধুসঙ্গের নানাভাবে গুণবর্ণনা আছে—তাহার বিন্দু-মাত্র-লাভে কিরূপে সর্ব্বার্থসিদ্ধি ঘটে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় এই ব্রহ্মচারীর উপাখ্যানে পাওয়া যায়।

(৬) ভাণ্ডীরবন হইতে সাধু মাধবদাস পুনরায় পুরুষোত্তম-ধামে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে এক গ্রামে তাঁহার বিষ্ণুপরায়ণ এক শিষ্যের বাস ছিল; ভক্তিমান্ এই শিষ্য প্রতিদিন শাস্ত্র-আলোচনায় এবং নৃত্যগীতের সহিত প্রেমানন্দে বৈষ্ণব ভক্তদিগের সহিত মধুর হরিসঙ্কীর্ত্তনে নিশা যাপন করিতেন।

সাধু মাধবদাস সেইস্থানে সন্ধ্যা-শেষে উপস্থিত হইলে “আঙ্গিনাতে” বসিয়া ভক্তদিগের মুখে “কৃষ্ণনাম” গান-রঙ্গ উপভোগ করিতে লাগিলেন; এই নাম-রঙ্গ দেখিয়া প্রতিদিন কীর্ত্তন শুনিতে তাঁহার মনে লোভ জন্মিল। তদনুযায়ী তিনি কীর্ত্তনশেষে তাঁহার শিষ্যের নিকট ছদ্মবেশে অগ্রসর হইলেন ও তাঁহাকে বলিলেন—“মহাশয়! আমি অতি কাঙ্গাল, আমার

জগতে কেহ নাই, পেটের জ্বালায় বৃথা পথে ঘাটে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সারা হই। আপনি যদি দয়া করিয়া এই অধমকে মাত্র পেট-ভাতায় যে কোনও ভাবে ভৃত্যরূপে আপনার নিকট স্থান দেন, বড় কৃতার্থ হই—আর কি বলিব? আপনার শরণ লইলাম—যাহা ইচ্ছা নিবেদন করুন্"।

সাধু মাধবদাসের এই কথা শুনিয়া শিষ্যটী তাঁহাকে না চিনিয়া গোসেবায় নিযুক্ত করিলেন। মহানুভব মাধবদাসও ছদ্মরূপে শিষ্য-গৃহে অপ্রকাশ থাকিয়া ভক্তবৃন্দের ভজনরঙ্গ প্রেমানন্দে প্রতিদিন উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় একমাসকাল অতীত হইলে তাঁহার আর এক শিষ্য তথায় দেখা করিতে আসিল। দুই তিন দিন এই শিষ্য গুরু-ভায়ের সহিত প্রেমানন্দে নামগানে বিহার করিতে করিতে একদিন কীর্ত্তন-শেষে গোশালার দুয়ারে দেখেন এক ধ্যানমগ্ন ব্যক্তির মুদ্রিত-নয়নে দর দর ধারে প্রেমাশ্রু বহিতেছে—কাঙ্গালের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গ অতি কৃশ ও মলিন—অথচ তাঁহার ভাব-সমাধিস্থ অবস্থা দেখিয়া বিস্ময়ভরে তথাকার অধিবাসীদিগকে তাঁহার পরিচয়-জিজ্ঞাসায় শুনিলেন এই ব্যক্তি সামান্য গোরক্ষক মাত্র।

এই শুনিয়া রাখালের চরিত্র অতীব অদ্ভুত বুঝিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার সন্নিকট হইয়া তিনি দেখিলেন সেই ব্যক্তি আকৃতি-প্রকৃতিতে তাঁহাদের গুরুদেব স্বয়ং সাধু মাধবদাস !!

এই দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া ক্ষিপ্রপদে তিনি গুরুভাইকে সঙ্গে আনিয়া ব্যাপার দেখাইলেন। গুরুভাই ইহাতে লজ্জা ও ভয়ে নির্ব্বাক্ হইয়া উদ্বিগ্ন মনে কাষ্ঠবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন। গুরুদেবের এই অদ্ভুত লীলা দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার পাদ-পীড়ন করিতেই সাধু মাধবদাসের বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল এবং তিনি দেখিলেন শিষ্যেরা

সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতের সহিত তাঁহার শ্রীচরণে নিপতিত!—ভূমিতে পড়িয়া তাহারা উচ্চনাদে ক্রন্দন করিতেছে!!!

শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! আপনার শ্রীচরণে কোন্ অপরাধে ভৃত্যাদিগকে এ ভাবে ছলনা করিয়া এই লজ্জাজনক কর্ম্ম আচরণ করাইয়া মহাপাতক-গ্রস্ত করিলেন? যদি অপরাধই হইয়া থাকে, "দণ্ড পাইয়া শোধনের প্রত্যাশী আমরা" তাহাতো আপনি ভালই জানেন। তবে কেন আমাদের অদৃষ্টে প্রভুর সেবাপরাধ ঘটিল? এখন তবে অধম আমাদের প্রতি কৃপাকটাক্ষ পাত করুন—সঙ্গে আসুন—শ্রীচরণ সেবা করিয়া আমরা ধন্য হই।"

এই দৃশ্যে সাধু মাধবদাস প্রমাদ গণিয়া উঠিলেন ও ভক্তদের অঙ্গ শ্রীহস্তে স্পর্শ করিয়া তাঁহাদের হৃদয়-বেদনার শান্তি করিলেন ও বলিলেন "বৎসগণ! তোমাদের অপরাধের কথাতো কিছুই জানিনা!!! দৈবক্রমে এই পথে যাইতে যাইতে আমার কৃষ্ণধনের নাম-কীর্ত্তন শুনিয়া তাহার উপভোগ-লালসায় আত্মগোপনে থাকাই একমাত্র উপায় নির্ণয় করিয়াছিলাম—আমাকে চিনিলে পর তোমরা পাছে কুণ্ঠিত হইলে রসভঙ্গ হইত সেই ভয়ে এই ভাবে থাকিয়া পরম-আনন্দ লাভ করিলাম—এস এস, আমরা এখন আবার প্রেমানন্দে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করি।" তাহার পর মহামহোৎসবে যে প্রেমানন্দের উদ্ভব হইল তাহা বর্ণনের অতীত। ভক্ত-হৃদয়ের কারণ্য-দৈন্য-রস যে কত মধুর তাহা এই আখ্যায়িকায় নিহিত দেখা যায়।

সুত-দুহিতৃ-কলত্র-ত্রাণ-ভারারত, ভব-
জলধি-মগ্ন আমাদের জন্য
শ্রীশ্রীমাধবদাসজীর শ্রীচরণ-তরণী
সতত সহায় হউক।

শ্রীমতী হরিভক্ত রাণীর চরিত্র।

অতি হরিভক্ত এক রাজা একমনে বিশেষ গোপনে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিতেন—তাঁহার এই গুপ্ত সাধনার বিষয় কেহই জানিতেন না। অতি শুদ্ধমতি, ভক্তিপরায়ণা তাঁহার রাণীও পরম-বৈষ্ণবী ছিলেন এবং সর্ব্বদা বিধিমত ভজন-পূজনে নিমগ্ন থাকিতেন—স্বামীকে হরিভক্তি-বিহীন মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদাই দুঃখিত থাকিতেন—স্বামীকে বহু বুঝাইলেও স্বামী বাহ্যতঃ উদাসীনের ন্যায় থাকিতেন; কিন্তু, মনে মনে রাণীর ভক্তিপরায়ণতা ও স্বামীর শুভচেষ্টায় উদ্বেগ দেখিয়া তিনি অতীব চিত্তপ্রসাদ লাভ করিতেন। স্বামীর মনে যাহাতে হরিভক্তির উদ্রেক হয় তজ্জন্য রাণী সদা-সর্ব্বদা আপনার ইষ্টদেবের নিকট প্রার্থনা করিতেন।

কালক্রমে, একদিন রাত্রিতে নিদ্রাযোগে আলস্য-ত্যাগকালে হঠাৎ তাঁহার মুখ হইতে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" নাম বাহির হইয়া পড়ে! রাণী ইহা শুনিয়াই পরমানন্দ লাভ করিলেন এবং অতি প্রত্যূষেই উঠিয়া মাঙ্গলিক গীতবাদ্য ও দানাদির সহিত বিশেষ আনন্দ-উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন।

রাজা নিদ্রা হইতে উঠিয়াই এইরূপ অদ্ভুত উৎসবের আয়োজন দেখিয়া কর্ম্মচারীদিগকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বুঝিলেন রাণীর আদেশই এই সব উৎসবের কারণ। কাজেই, তিনি রাণীর নিকট গিয়া বিশেষ কৌতূহলের সহিত তাঁহাকে এই উৎসবের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তরে রাণী বলিলেন—"প্রভু! আজ আমার পরম শুভদিন উপস্থিত!!! আমার প্রাণারাম কৃষ্ণ-সুন্দরের সুমধুর নাম গত নিশায় ঘুমের ঘোরে আপনার শ্রীমুখ হইতে

উচ্চারিত হইয়াছে !!! তাই আজ প্রাণের সাধে আমাদের পরম মাঙ্গলিক উৎসবের অয়োজন করিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়াই রাজা "হাহাকার" করিয়া বলিয়া উঠিলেন "ওগো, একি দুর্ভাগ্য আমার !! এতদিন হৃদয়-কন্দরে যাঁহাকে অতি গোপনে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, নিশাযোগে তিনি আমার অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া গেলেন !!!" এই খেদোক্তি করিতে করিতেই তিনি ভূমিতে হত-চেতন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন !!!

অকস্মাৎ এই বিপদ্‌পাতে রাণীও শিরে করাঘাত-পূর্ব্বক এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন "হায় হায়, দুর্ভাগ্য আমার ! এমন কৃষ্ণভক্ত স্বামী হইতে আজ বঞ্চিত হইলাম—"এ হেন গুণের নিধি যে তিনি" এ কথা পূর্ব্বে বুঝি নাই !! অহো দুর্দ্দৈব ! আমার আজ কেন এ দশা ঘটিল ? স্বামীর হরিভক্তি-বিষয়ে সন্দেহজনিত মহাপাপেই নিশ্চয় আমার আজ এই দশা ঘটিয়া থাকিবে !!" এই বলিয়া ক্রন্দন ও বিলাপ করিতে করিতে রাণীরও প্রাণবায়ু প্রায় বাহির হইতে বসিল !!

এদিকে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই প্রেমানুগত, ভক্তবৎসল কৃষ্ণ-সুন্দর এই লীলারঙ্গ উপভোগ করিয়া নবঘনশ্যাম মূর্ত্তি-পরিগ্রহ-পূর্ব্বক তাঁহাদের অঙ্গে পরম পাবন, ত্রিতাপনাশন শ্রীহস্ত বুলাইতেই তাঁহাদের চেতনা ফিরিয়া আসিল এবং সম্মুখেই বিরাজমান আপনাদের নয়নাভিরাম চিরবাঞ্ছিত, প্রাণেশ্বর, ত্রিভঙ্গ-মুরলীধর শ্যামসুন্দর-দেবের শ্রীমূর্ত্তি-দর্শনে তাঁহাদের প্রেমানন্দ উথলিয়া উঠিল—ভূশয্যা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও পরম যত্নে, রত্নসিংহাসনে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করিয়া বিধিমত তাঁহার অভিষেকাদি নিষ্পন্ন হইলে দিবানিশি তদ্‌গত-চিত্তে কৃষ্ণ-সুন্দরের ভজনপূজনে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকিলেন।

কালক্রমে, দেহান্ত হইলে বৈকুণ্ঠধামেই তাঁহারা চিরকালের জন্য অধিষ্ঠিত হইয়া কৃষ্ণসুন্দরের সহিত সাক্ষাৎ যোগানন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।

কালকলুষনাশন এ হেন ভক্ত-দম্পতীর
শ্রীচরণে বিষয়নিমগ্ন আমাদের
সতত কোটি কোটি নমস্কার।

শ্রীশ্রী"ভক্ত-মহান্তীজীর" চরিত্র।

উড়িষ্যা-দেশের অন্তর্গত "যাজপুর" গ্রামে "মহান্তী"-উপাধিধারী "করণ" কায়স্থ-বংশীয় পরম কৃষ্ণভক্ত এক অতীব দরিদ্রের বাস ছিল। অতিশয় কৃষ্ণ-ভক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে **"ভক্ত মহান্তী"** নাম দিয়াছিল। অর্থহীন হইলে কি হয়? যে ভগবদ্ভক্তি ও প্রেম-ধনে তিনি ধনী ছিলেন, সে ধন রাজাধিরাজের প্রাসাদেও সুদুর্লভ!! দেবতারাও এই মহাধনের নিত্য-ভিখারী!!! সেই "ভক্ত-মহান্তীজীর" চরিত্র-বিষয়ে একটী মাত্র আখ্যায়িকা এখানে বর্ণনীয়।

এই "ভক্ত-মহান্তীর" সংসারে একটী ৪ বৎসরের শিশু পুত্র, দুইটী ৭ ও ১ বৎসরের কন্যা ও পরম ভক্তিমতী, সাধ্বী গৃহিনী ছাড়া আর কেহ ছিল না। প্রত্যহ ভিক্ষার দ্বারা যাহা কিছু তিনি পাইতেন তাহাতেই ছেলে-মেয়েদের খাওয়াইয়া অবশিষ্ট যেটুকু থাকিত তাহাই স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে সেবা করিয়া মনের সুখে "কৃষ্ণ-ভজনে" দিন-পাত করিতেন। দৈবাৎ কোনও অতিথি আসিলে তাঁহার সেবা করিতে আপনাদের উভয়কে উপবাসী থাকিতে হইলেও তাঁহাদের চিত্ত-প্রসাদ কিছু-মাত্র খর্ব হইত না!!! ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিয়া "নারায়ণ-রূপী অতিথি-সেবার মহিমায় যে অপার আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর কোনও দুঃখই সে মহানন্দকে দমন করিতে পারে না!!!

এই ভাবে মহান্তীজীর দিন সুখ-দুঃখে কাটিতে থাকে!! কালক্রমে, একবার উড়িষ্যা-দেশে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হয়। চতুর্দ্দিকে নরনারী অন্নাভাবে "হাহাকার" করিতে থাকে!

খাদ্যাভাবে গাছের পাতা, এমন কি—পুকুরের "পানা" পর্য্যন্ত ক্ষুৎ-পীড়িত নর-নারীর ভক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল!! অচিরে ইহাও যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন সহস্র সহস্র নর-নারী ক্ষুধার তাড়নে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল!! কেহ কেহ বা ক্ষুধার জ্বালায় মৃতদেহের মাংস পর্য্যন্ত শেষ সম্বল-স্বরূপ খাইতে আরম্ভ করিল!!!

এমনই মহা দুর্দ্দিনে (আজ) "ভক্ত-মহান্তীজী" শিশু-সন্তান লইয়া সস্ত্রীক তিন-দিন উপবাসী!!! দেশের জন-সাধারণ যেখানে দুর্ভিক্ষের করাল কবলে মৃত্যু-মুখী, সেখানে "ভক্ত-মহান্তীজীর" আজ ভিক্ষার আশা কোথায়?—সামান্য "ক্ষুদ্-কুড়ো" খাওয়াইয়াও যিনি ছেলে-মেয়েদের "হাসি-মুখ"-টুকুই দেখে সর্ব্বদা কৃষ্ণ-ভজনে সস্ত্রীক প্রসন্ন-চিত্ত থাকিতেন, আজ সেই মহাভক্ত, প্রেমিক-চূড়ামণিও ছেলে-মেয়েদের ক্ষুধার জ্বালা দেখে ভাবিয়া আকুল!! তথাপি, তাঁহার প্রাণ-বল্লভ কৃষ্ণসুন্দরকে তিনি ভুলিলেন না!!! মনে মনে ও চোখের জলে শুধু তাঁহাকেই স্মরণ করিয়া বলিলেন—"প্রভু লীলাময়! আমরা দু-জনে মরি, তাহাতে ক্ষতি বা দুঃখ নেই; কিন্তু, কোমল-মতি, নিষ্পাপ-হৃদয় শিশু-সন্তানদের অপরাধ যদি আমাদেরই অপরাধে হইয়া থাকে—যত শাস্তি তোমার অধিকারে আছে সমস্ত আমাদেরকেই দাও; কিন্তু শুধু, এইটুকু মিনতি করি প্রভু, আমাদের সকল শাস্তি-গ্রহণের পরিবর্ত্তে মাত্র এক মুঠো ক্ষুধার অন্ন ছেলেগুলোর মুখে জুটিয়ে দিও; আমি যে তোমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না প্রভু!!! হয়, তোমার এই রুদ্র লীলা সম্বরণ কর, নচেৎ এই মুহূর্ত্তে আমাদের সকলের **একসঙ্গে** ভব-লীলা শেষ কর। আর কি বলিব প্রভু? তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই পূর্ণ করে তুমি ধন্য হও।"

এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রী মহান্ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে আসিয়া মহান্তীজীর পদতলে আছড়াইয়া পড়িয়া বলিলেন—"ওগো! আর যে বাছাদের মুখের দিকে চাওয়া যায় না! না খেতে পেয়ে নিজেরও বুকের রক্ত সব শুকিয়ে গেছে! আহা! বাছাদের মুখে দিতে এখন আর এক ফোঁটা দুধও যে বুকে নেই গো!!!"

স্ত্রীর কোলে ছেলে-মেয়ে-গুলো সান্ত্বনার মাঝে থাকায় মহান্তীজীর যে-টুকু স্বস্তি ছিল, তাঁহার করুণ আর্ত্তনাদে এই দুঃখের দিনে সে-টুকুও গেল! অগত্যা তিনি চোখের জলে দীর্ঘ-শ্বাসে বলিলেন—"হা, ভগবান্! 'আমরা সপরিবারে তোমার দাস হ'য়ে না খেতে পেয়ে মরি'—এই বুঝি তোমার ইচ্ছা!!! ভাল ঠাকুর! তবে, তা'ই হো'ক্—আমাদের সকলের চিহ্ন তোমার পৃথিবীর বুক থেকে এই মুহূর্ত্তে **একসঙ্গে** মুছে যা'ক্—তুমি ধন্য হও!!!" এই বলিতে বলিতেই তিনি প্রেম-ভাবাবেশে **মূর্চ্ছিত** হইয়া পড়িলেন! ধন্য ধন্য, ভক্তের মহাপ্রাণ!! এত নিদারুণ কষ্টে প্রাণবায়ু গেলেই হয়, তবুও ভগবানে **বিশ্বাস** যে একবার **তাঁকে** না দেখ্‌লেও যা'য় না!!!

মূর্চ্ছা-ভঙ্গের পরই মহান্তীজীর স্ত্রী আবার কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীকে বলিলেন—"ওগো! আমার যেন তোমা-ছাড়া আর কোনো আত্মীয়-বন্ধু নেই যে এই দুঃসময়ে তা'দের কাছে যাবো!! কিন্তু, তোমারও কি পৃথিবীতে কেউ নেই? নিশ্চয়ই আছে; চল না গো! আমরা প্রাণ দিয়ে তা'দের সেবা কোর্‌বো—তা' হ'লেই দুমুঠো ভাত জুটবে।"

এত দুঃখেও "মহান্তীজী" অদৃষ্টের পরিহাসে হেঁসে ফেল্‌লেন!!! উত্তরে স্ত্রীকে বল্‌লেন—"বাস্তবিকই, আমারও কেউ কোথাও নেই; তবুও মাত্র একজন **"বন্ধু"** আছেন! "তাঁর"

কাছে গেলে নিশ্চয়ই আশ্রয় পাওয়া যায়!! কারণ, "তিনি" সর্ব্বদাই বড় দয়ালু!! জগতের সকল নিঃস্ব, কাঙ্গালকে তিনি সব সময়ে বুকে টেনে নিয়ে আশ্রয় দেন্!!! নাম তাঁর **"দীন-বন্ধু"**।

কিন্তু, সে যে এখান থেকে অনেক দূরের পথ! পাঁচ দিন ধ'রে একাদিক্রমে চল্‌তে থাক্‌লে তবে "নীলাচল-ধামে" আমার 'সেই একমাত্র "বন্ধুর" কাছে পৌঁছান যায়!! কিন্তু, এত দূর পথে এই সব জীর্ণ, শীর্ণ, ক্ষুধায় মৃত্যু-মুখী ছেলে-মেয়েগুলোকে কি ক'রে নিয়ে যাওয়া যায়, বল দেখি ?"

এই আশার কথা শুনেই "মহান্তীজীর" স্ত্রীর মৃত-প্রায় প্রাণে কি বিপুল আনন্দ ও উৎসাহের বেগ দেখ!!! তিনি সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন—"ওগো, সে কি কথা? এমন বন্ধু থাক্‌তে, বাছারা আমার না খেয়ে চোখের সাম্‌নে মর্‌বে? না না! তা' হ'বে না। মরে, বেঁচে—যেমন ক'রেই হোক্, এদেরকে নিয়ে যেতেই হ'বে।" আহা! এত দুঃখেও—তাঁ'র চোখ দিয়ে আনন্দের অশ্রুধারা বহিয়া পড়িল!!!

মহান্তীজী একবার ভাবিলেন "যিনি সকলকে খেতে দেবার মালিক, তিনি দিলে তো এখানেই দিতে পারেন; আর, না দিলে, সারা পৃথিবী ঘুর্‌লেও কিছু পাওয়া যা'বে না!! **মৃত্যু** যদি নিতে আসে, দেশ ছেড়ে যেখানেই পালাও, সে পিছনেই ছুটবে। তবে, আর এগিয়ে গিয়েই বা হ'বে কি ?

আবার, পর মুহূর্ত্তেই ভাবিলেন—"এই দুর্ভিক্ষের গ্রাসে, পেটের জ্বালায় মর্‌বার সময় যদি **"নীলাচল-নাথের"** অপরূপ রূপরাশিটা দেখা ভাগ্যে ঘটে ওঠে, তা'র চেয়ে আর বাঞ্ছনীয় কি থাকতে পারে? স্বয়ং **মরণও** যে তখন শত

বেদনার মধ্যে অনন্ত মধুর-শীতল হ'য়ে উঠ্‌বে !!! এই ভাবিতে ভাবিতেই মহা-ভাবাবেশে তিনি স্ত্রীকে বলিয়া উঠিলেন –"হাঁ, গো ! হাঁ ! তুমি ঠিকই ব'লেছ !! চল চল, "**বন্ধুর**" কাছে এগিয়ে পড়ি চল !!!"

সেই অনুযায়ী, মহাত্মা মহান্তজী সপরিবারে অতীব ক্লান্ত চরণে পথ চ'লেছেন ! শতবার চরণ অবসন্ন হ'য়ে আস্‌ছে—বাস্তবিকই, সে চরণ আর অবসাদের ভারে চল্‌তে চায় না ; এদিকে, শরীরও যে আর বয় না ; তবুও, তিনি যে জীবনকে পণ রেখেই সকলকে সঙ্গে নিয়ে চ'লেছেন !!!

এই ভাবে জীর্ণশীর্ণ, ক্লান্ত দেহভার নিয়ে তাঁহাদের পাঁচ দিন অতীত হইয়া আসিল ! ইহার অপেক্ষা আশ্চর্য্যের আর কি থাকিতে পারে ? ঐ দেখ ! সন্ধ্যার পূর্ব্বে গোধূলির ম্লান আলোক-রেখা আকাশের বুকে প্রায় নিভে এসেছে !! এমন সময়ে, ঐ দেখ ! অদূরে সন্ধ্যার আঁধার ভেদ ক'রে "**নীলাচল-নাথের**" বিরাট্‌ মন্দিরের ধ্বজা চোখের সাম্‌নে ভেসে উঠ্‌ল !!! তখনই, দেখ ! তাঁহার মৃতপ্রায় দেহ-মনে সে কি বিপুল উৎসাহের বেগ !! আর একটু এগিয়ে যেতে পার্‌লেই তো "অনন্ত, অক্ষয় স্বর্গ !" অফুরন্ত অন্নের ভাণ্ডার !! এই আশাতেই কোথায় গেল অনাহারের ক্লান্তি, কোথায় বা নিদারুণ, দুর্গম পথের অসহ্য শ্রান্তি !!!

আর একটু-খানি-মাত্র পথ সাম্‌নে প'ড়ে আছে ! আশার উৎসাহে এগিয়েই চ'লেছেন ! ঠিক এই সময়ে—ঐ যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতির নিয়মিত শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল ; পথ অতিক্রম করিবার উৎসাহ ভক্ত-হৃদয়ে আরও বাড়িয়া উঠিল !! আর একটু পরেই "ভক্ত-মহান্তজী" ছুটিয়া আসিয়া সপরিবারে শ্রীমন্দিরের

সিংহদ্বারে "ঝাঁপ্" ছাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন! চাহিয়া দেখেন— "আগ্রহ কাহারও কিছু কম নয়!" অসংখ্য নরনারী শ্রীমন্দিরের দুয়ার আগ্‌লে দাঁড়িয়ে আছে!!! সকলেই চায় **সর্ব্বপ্রথমে** কাছে গিয়া "প্রাণ ভরিয়া" শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে ও হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করিতে!!!" ইহার উপর আবার দ্বার-রক্ষীর নির্য্যাতন, ভৎ'সনা তো আছেই!!!

কাজেই, মহান্তীজী বুঝিলেন "এই জনস্রোত ঠেলে উপবাস-ক্লিষ্ট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তাঁর "বন্ধুর" কাছে পৌছান অসম্ভব"— তখন, অগত্যা দূর হইতেই পতিতপাবন জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া "ভাতের ফেনের নালার" পাশে আসিয়া তিনি বসিয়া পড়িলেন।

তখন স্ত্রী বলিলেন—"ওগো! আর দেরী কেন? শীঘ্র তোমার "**বন্ধুর**" সঙ্গে দেখা ক'রে কিছু খাবার নিয়ে এসে আগে ছেলে-মেয়েগুলোকে খাইয়ে বাঁচাও—বাছারা বুঝি আর বাঁচে না!!!"

তখন, উত্তরে মহান্তীজী বলিলেন "ওগো! বড় সৌভাগ্য আমাদের যে প্রিয়তম "**বন্ধুর**" দুয়ারে আমরা এসে পৌছেছি! কিন্তু, খুব বড়লোক "বন্ধু" যে আমার আজ কত ব্যস্ত, তা' তো চোখেই দেখ্‌তে পা'চ্ছ!! কত কষ্ট সহ্য ক'রে এই সুদূস্তর পথ অতিক্রম ক'রে আমরা যখন এখানে এসে পৌছ্‌তে পেরেছি, তখন আর একটু সইতে কি আমরা পারি না? না হয়, সইতে সইতেই মর্‌বো! মরণ তো আছেই; কিন্তু প্রিয়তমের দেখা পেয়ে মরেই ধন্য হই না কেন? এখন, "**বন্ধুর**" আমার অনেক দেশ থেকে সুস্থ, দুঃস্থ কত বন্ধুরা এসেছেন— তা' বলে কি "তিনি" আমাদেরকে দেখেন নি' মনে করেছ? আগেই তো বলেছি—"তিনি" সকলকে সমান আদর করেন!!!

আমাদের দুঃখে "তিনি" যে কত কাতর বুঝ্‌তে পা'চ্ছনা? ঐ দেখ! "ফেনের নালার" পাশে "তিনি" আমাদের স্থান দিয়েছেন!!! এস এস, "বন্ধুর" প্রথম নিবেদন—যা' কেউ পায় না—"সেই পরমামৃত-ফেন-রাশি" সকলে খেয়ে আজ রাত্রি-যাপন করি। মনে ক'রে দেখ—"দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে আমাদের জন্য কুক্কুর-শৃগালের গলিত মাংস পর্য্যন্ত ছিল না!! কাতরতা পরিহার কর; আমার "বন্ধুর" প্রথম প্রেম-নিবেদন "অমৃত-তুল্য ফেনরাশি" পান কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে "বন্ধু" আমার কত দয়াল্‌!!! শান্তির স্নিগ্ধতায় দেহ-প্রাণ পূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌বে!!! "তাঁ'র" দয়া না থাক্‌লে "আমরা যে পথের মাঝেই মরে যেতাম্‌" সে কথা কি আবার বল্‌তে হ'বে?"

সাধু মহান্তীজীর এই কথায় সকলে মিলিয়া সপরিবারে সেই "ফেন-রাশি-পানে" অমৃত-পানের ন্যায় তৃপ্ত হ'য়ে অতুল স্নিগ্ধতায় শ্রান্তি-নাশিনী নিদ্রার কোলে বিশ্রাম লাভ করিল!!! দেখ, দেখ! চাঁদের আলোয়, বসন্ত বায়ুর মাঝে, সুনীল আকাশের নীচে সকলে কেমন মহাশান্তির ঘুমে অচেতন!!! কেবল সাধু মহান্তী-ই এই দৃশ্যে মহাতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে প্রেমভাবাবেশে "বন্ধুকে" তাঁহার, এই বলিয়া নীরবে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন ঃ—

জগৎ জুড়িয়া তোমার প্রকাশ
তোমারই চরণ-আশে;
দেখে সুখী হও, যখন সকলে
আসে তব পাদ-দেশে!
ও রাঙা চরণ সকলে দেখিল
আমি হতভাগা শুধু;
চিরদিন কি গো, র'ব পথ চেয়ে

দেখা কি পা'ব না কভু ?
ধন্য তোমার মহিমা-অপার
কারণ, তুমি যে "বড়" !
(আমি) "ছোট" ব'লে, কাঁদায়ে আমারে
মহিমা প্রকাশ কর !!
(তবু) তুমি সুখে থাক, চির-দুঃখী আমি
ভেবো না আমার তরে ;
(আমি) অতি হতভাগা, ভাসি আঁখিনীরে
তুমি ভুলে থেকো মোরে !!!

গভীর রাত্রিতে ভক্তের এই আকুল ক্রন্দন শ্রীমন্দিরের পাষাণ-প্রাচীর ভেদ ক'রে দেবতার প্রাণে আঘাত করিল! ভক্তের কাতরতায় ভক্তাধীনের প্রাণ এবারে ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লো !! আর "তিনি" স্থির থাক্‌তে পার্‌লেন না! দয়াময় তখন স্বয়ং ভাণ্ডার থেকে রত্ন-থালী সুমিষ্ট প্রসাদে পূর্ণ ক'রে ভক্তের কাছে ব্রাহ্মণ-বালকের বেশে এসে দাঁড়া'লেন !!! নিদ্রিতপ্রায় মহান্তীজীকে দ্বার-দেশ হইতে ডাকিয়া বলিলেন—"ওগো বন্ধু! ওঠ ওঠ, আমি তোমাদের জন্য ভাল ভাল খাবার নিয়ে এসেছি—নিয়ে যাও—সকলে মিলে সুখে আহার কর। আমার দেরী হ'য়ে গেল, কিছু মনে কোরো না।"

সাধু মহান্তীর নিদ্রালস কাণে সে মধুর আহ্বান পৌঁছিল বটে, কিন্তু "আশাতীত এই সব ভালবাসার কথা ও ডাক অধমের প্রতি কিরূপে সম্ভবপর ?" মনে মনে সেজন্য ইতস্ততঃ হওয়ায় চুপ্‌ ক'রেই প'ড়ে আছেন।

আবার সেই একই ডাক এল—"বন্ধু, বন্ধু! শীঘ্র এস" !!"

এবার, মহান্তীজীর পত্নীও সেই ডাকে জাগিয়া উঠিলেন।

স্বামীকে তখনি চেঁচিয়ে ডেকে বল্‌লেন-"ওগো শুন্‌ছো! দেখ, দেখ! "বন্ধু" বুঝি দুয়ারের কাছে ডাক্‌ছেন! ওঠো ওঠো, শীঘ্র যাও।"

এইবারে মহান্তীজী নিঃসন্দেহ হ'য়ে তাড়াতাড়ি উঠেই পাগলের মতন ছুটলেন! দুয়ারে পৌঁছ্‌তেই দেখেন "এক সুকুমার ব্রাহ্মণ-কুমার স্বর্ণ-থালীতে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য নিয়ে দণ্ডায়মান!!! থালী ও খাদ্যের ভারে সুকোমল হাত দুখানি তাঁর কাঁপ্‌ছে!!!"

ভক্ত সাধু তখনি দু-হাত বাড়িয়ে আকুল আগ্রহে থালাখানি ধ'রে মাথায় তুলে নিলেন্‌! অম্‌নি কি এক অপূর্ব্ব পুলক-স্পন্দনের আবেশে তাঁ'র সর্ব্ব শরীর অবশ-প্রায় হ'য়ে পড়্‌ল!!! প্রভুও তাড়াতাড়ি চ'লে গেলেন! "তাঁ'র" রাঙা পা-দুখানি বুকে জড়িয়ে কত কথা ভক্তের বল্‌বার ছিল—কিছুই হোলো না!!! কে যেন তাঁ'র সকল কথা চুরি ক'রে নিয়ে গেল!!! ভাবাবেশে বিভোর হ'য়ে "মাতালের মত" টল্‌তে টল্‌তে ভক্ত যথাস্থানে ফিরে গিয়ে সকলে মিলে পরমানন্দে ভোজনে বস্‌লেন। কিন্তু কই সে রাক্ষসী ক্ষুধা!!! ক্ষুধা-তৃষ্ণার লেশ-মাত্র কাহারও নেই! কে যেন তাঁহাদের সমস্ত দেহ-প্রাণকে অমৃত-রস-ধারায় ডুবিয়ে দিয়েছে!! তবুও, শেষ কণা পর্য্যন্ত সকলে নিঃশেষ ক'রে থালাখানি "ধুয়ে মুছে" "বন্ধুকে" ফিরিয়ে দিতে গিয়ে ভক্ত দেখেন্‌—"দুয়ার অর্গল-বদ্ধ!!!" শত করাঘাতে, শত চীৎকারেও দুয়ার খুল্‌ল না দেখে তিনি ফিরে এসে শতবার থালাখানি বুকের মাঝে চেপে ধর্‌লেন!! শেষে ছিন্ন বসনের মধ্যে ঢেকে মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়্‌লেন। স্বর্গের শত সুখ-স্বপ্ন নিয়ে "নিদ্রা" এসে তাঁ'র চোখে পদ্ম-হস্ত বুলিয়ে দিয়ে গেল!!!

প্রভাতে লতায়-পাতায়, ফলে-ফুলে, মাঠে-ঘাঠে, শ্রীমন্দিরের সর্ব্বত্র তরুণ-সূর্য্যের সোণালি রাগ দেবতার অনুরাগের হাসির মতন ছড়িয়ে পড়েছে !! সাধু মহান্তী সপরিবারে সুখ-নিদ্রায় মগ্ন! দুঃখ-কষ্টের সব রেখা মুছে গিয়ে মুখে কি অপূর্ব্ব মধুরিমা প্রতিভাসিত! ঊষার রক্ত-রাগে সে মাধুরী আরও মধুর হ'য়ে উঠেছে!

এদিকে, শ্রীমন্দিরের চারিদিকে ভয়ানক গোলমাল প'ড়ে গেছে। গত রাত্রিতে প্রভুর ভাণ্ডার থেকে একটী রত্ন-থালী কে চুরি করেছে! এত বড় সাহস কা'র? চারিদিকে খোঁজাখুঁজি প'ড়ে গেছে; এমন সময় হঠাৎ একজন বিস্ময়ভরে দেখ্‌লে "সাধু মহান্তীর মস্তকে শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বসনের ফাঁক দিয়ে "সোণার" আভা সূর্য্যের ছটায় বাইরে ছড়িয়ে প'ড়েছে!! সকলেই অম্‌নি ছুটে গিয়ে দেখে—এই যে "প্রভুর সেই অপহৃত স্বর্ণ-থালী !!!"

আর যায় কোথা? "চোর, চোর!" ব'লে সকলে তখনি তাঁকে বেঁধে ফেলে প্রহারে জর্জ্জরিত ক'রে ফেল্‌ল! সাধু মহান্তী তো অবাক্‌ !! "এ কি "বন্ধুর" লীলা !!!" স্ত্রী-পুত্র-কন্যা চম্‌কে জেগে উঠে মর্ম্ম-ভেদী আর্ত্তনাদ ক'রে উঠ্‌ল! কিন্তু, সে "হাহাকার" শোনে কে?

সাধু মহান্তী করযোড়ে সবাইকে বল্‌লেন—"ওগো! তোমরা আমাকে বৃথা শাস্তি দিও না; একটু আমার কথা শোনো— "আমি চোর নই"—এ যে আমার প্রভুর বড় আদরের দান !!! ছেলে-পুলে নিয়ে অনাহারে মরি দেখে গভীর রাত্রিতে **"বন্ধু"** যে আমায় নিজ হাতে এই থালায় সন্দেশ, পায়স প্রভৃতি কত কি **"মহাপ্রসাদ"** সাজিয়ে দিয়ে গেছেন !! খেয়ে দেয়ে থালা ফিরে দিতে গিয়ে "বন্ধুর" সাড়া না পেয়ে শেষে বুকে মাথায়

ক'রে আগ্‌লিয়ে রেখেছিলাম, যেন সকালে ঘুম থেকে উঠেই "তাঁর" থালা ফিরিয়ে দিতে পারি। কিন্তু, নিদ্রা-ভঙ্গের পূর্ব্বেই এ কি বিড়ম্বনা!!! থালা ফিরিয়ে নিয়ে দরিদ্র, নির্দোষ আমাকে ছেড়ে দাও গো—আমার স্ত্রীপুত্র-কন্যাদিগকে নিরাশার অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা কর।"

সাধু মহান্তীর কথায় কেহ কেহ তাঁ'কে পাগল, কেহ কেহ বা "ভণ্ড" বলে অট্টহাস্যের সহিত আরও প্রহার দিয়ে মহোল্লাসে তাঁ'কে কারাগারে বন্দী ক'রল!!! সাধু মহান্তী তখন চোখ বুজে অটল হ'য়ে গোবিন্দকে স্মরণ ক'রতে লাগ্‌লেন। ওদিকে, নিরুপায় স্ত্রীপুত্রকন্যা তাঁর, ভীষণ আর্ত্তনাদের সহিত সেই "ফেনের নালার" পাশেই লুটিয়ে পড়্‌ল!!!

ভগবানের লীলার উদ্দেশ্য মোহান্ধ জীব কিছুই জানে না!!! সোণা চোখে দেখেই কেহ নেয় না; তা'কে আগুনে পুড়িয়ে ময়লা কেটে গেলে "কষ্টি" পাথরে ঘসে পরীক্ষা ক'রে, তবে নেয়। শেষ পর্য্যন্ত পরীক্ষায় যা' টিকে যায় সেইটীই খাঁটি সোণা। সেইরূপ, ভক্তি থাক্‌লেই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়; তবে, ভক্তিটাও খাঁটি হওয়া চাই; মানুষ নিজের সুখ-দুঃখ ভুলে, ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ ক'রে, কেবল "তাঁ'কে" লাভ ক'রবার জন্যেই পাগল হ'য়ে "দেহ থেকে আত্মা পর্য্যন্ত" সর্ব্বস্ব যখন "তাঁর" পায়ে নিবেদন ক'রতে পারে তখনই "তিনি" তা'কে কোলে তুলে নে'ন্। "দুঃখ-রূপ" অগ্নির দাহনে ভগবান্ ভক্তের "ভক্তি-রূপ" সোণাকে শুদ্ধ ক'রে নে'ন্। তাই, ভক্ত-মহান্তীর আজ এই কঠিন পরীক্ষা!!!

অন্ধকারার পাষাণ-প্রাচীর ভেদ ক'রে আজ উঠ্‌ছে কেবল ভক্তের স্তব-গান আর ভগবানের শ্রীচরণে আকুলভাবে "তাঁকে"

পাওয়ার জন্যে প্রার্থনার তপ্ত দীর্ঘশ্বাস !!! শৃঙ্খলিত বন্দীর মুখে শারীরিক নির্য্যাতন-বেদনার চিহ্ন-মাত্র নাই !!! আছে শুধু— অন্তরের অন্তঃস্থল হ'তে কেবল দৈন্ত-নিবেদন ও শুদ্ধা ভক্তির পুষ্পহার নিবেদন !!!

ওঃ! প্রাণ-নাথ, জগতের নাথ, যিনি সকলের পরম "বন্ধু" "তাঁহার" ভালবাসায় ভক্তের কি অটল বিশ্বাস দেখ !! প্রলয়ের ঝঞ্ঝাও এ বিশ্বাস টলাতে পারে না !!! এমন ক'রে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ডাক্‌লে দেবতার সাধ্য কি চুপ ক'রে থাকেন? লীলাময় দেখেন **"শুধু অন্তরের টান"**—দুঃখকে যিনি "তাঁহারই" পরীক্ষার **"দান"** ব'লে গ্রহণ ক'রে নিতে পারেন তিনিই শুধু ভগবানকে ভালবাস্‌তে পারেন—সাধু মহান্তীর চরিত্রে এ কথা বেশ বোঝা যায়। এইরূপ অদ্ভুত দুঃখ-সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাসের যে শেষে জয় অনিবার্য্য—এ বিষয়ে সাধু মহান্তীর চরিত্র একটী প্রকৃষ্ট পরিচয়! দুঃখ-সাগর পাড়ি দিতে পা'রলে, কেমন ক'রে প্রেম-নিধি লাভ হয়—যা' পেলে **"সব চাওয়া ও সব পাওয়ার"** শেষ হ'য়ে প্রাণে পরমানন্দ বিরাজ করে, এই সকল ভক্ত-চরিত্রেই স্বয়ং ভগবান্ সে বিষয় আমাদের কাছে প্রকট ক'রেছেন।

"দীন-নাথ" এই চরিত্রে আমাদের দেখা'লেন্—ভক্ত "তাঁ'কে" হার মানিয়েছে। এত নির্য্যাতনেও সে "দীনবন্ধুকে" ছাড়ে নি' !!! এইবার "দীনবন্ধু" তাঁ'র ভক্তের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন :—

গভীর রাত্রি! ঊষা-সমাগমের পূর্ব্বে সকলেই ঘুমে অচেতন! জেগে আছেন, কেবল সেই অনাদি, বিরাট্ পুরুষ !!! মহারাজ প্রতাপরুদ্র মহামূল্য, সুকোমল শয্যায় সুখনিদ্রায় নিমগ্ন! এমন সময় প্রভু জগন্নাথ-দেব স্বপ্ন-যোগে তাঁ'কে অভিযোগ-ভরে ব'ললেন—

"তোমার ঘরে বন্ধু-বান্ধব এলে কি তুমি তা'দের না খাইয়ে তাড়িয়ে দাও? আর, কোথায় "যাজপুর"! সেখান থেকে আমার এক বন্ধু দুর্ভিক্ষের তাড়নায় সপরিবারে খেতে না পেয়ে মৃতপ্রায়-অবস্থায় ছেলে-মেয়েদের নিয়ে আমার দুয়ারে এসেছিল; তা'কে আমি নিজেই আমার রত্ন-থালীতে খাবার দিয়েছিলাম ব'লে তোমার লোকজনেরা তা'র কাছ থেকে থালা কেড়ে নিয়ে চোরের শাস্তি দিয়ে তা'কে হাত-পায়ে বেঁধে অন্ধ-কারায় বন্দী করে রেখেছে!!! তা'র স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিঃসহায় অবস্থায় নিদারুণ দুঃখে দিন-রাত অনাহারে "হাহাকার" করছে! হায় হায়! এও আমাকে চোখে দেখ্‌তে হোলো!!! তুমি আমার আদেশ শোনো—"প্রভাতেই তা'কে কারামুক্ত ক'রে তা'র পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চেও—আর, তীর্থ-জলে স্নান করিয়ে বহুমূল্য বেশভূষা ও অলঙ্কার দিয়ে তা'কে আমার মন্দিরের হিসাব-রক্ষকের পদে নিযুক্ত কোরো। আর, সে আজীবন সপরিবারে যা'তে সর্ব্বোত্তম ভোজ্য পায় তা'রও ব্যবস্থা কোরো—নচেৎ তোমার রাজ্যের মঙ্গল নেই জেনো।"

স্বপ্ন-ভঙ্গেই মহারাজ ত্রস্ত হ'য়ে উঠে প্রভুর আদেশ-পালনের জন্য যাত্রা করিতে তৎপর হইয়া পড়িলেন। এদিকে নিরীহ ভক্ত মহান্তীজী কিছুই জানেন্ না!! তিনি ফলাফলের ধারও ধারেন্ না—কারাগারের নিভৃত কোণে ব'সে কেবল তাঁ'র "চিরাশ্রয়কে" ডাকছেন, আর, অনুতাপের অশ্রু-জলে জন্ম-জন্মান্তরের কৃতাপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছেন্! ঘোরা নিশিথিনী শুধু ব'সে ব'সে আপনার কালো আঁচল দিয়ে তাঁ'র চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছিল!!! কিছু পরেই, কারা-দ্বারের রন্ধ্র-পথে ভক্তের দর্শন-আশায় নবীন

অরুণ-রাগে উষা-রাণী "উঁকি-ঝুঁকি" মেরে ধীরে ধীরে চ'লে গেল !!

উষার পশ্চাতেই পাত্র-মিত্র নিয়ে মহারাজ প্রতাপরুদ্র সেখানে পৌঁছিতেই সশব্দে কারাগারের লৌহ-দুয়ার খুলে গেল !!! রাজা দেখ্‌লেন—"স্বপ্ন" তাঁ'র বর্ণে বর্ণে সত্য ; ছুটে গিয়ে ভক্তের শৃঙ্খল খুলে ফেলে তাঁ'র চরণে লুটিয়ে প'ড়ে বার বার' ক্ষমা চাইতে লাগ্‌লেন !!!

ভক্ত মহান্তী যেন আর এক বিপদ গণনা ক'রলেন ! যতই রাজাকে নিবারণ ক'রতে চা'ন্, ততই তিনি চরণ জড়িয়ে ধরেন্ !!! শেষে ভক্তকে বহু সমাদরে শ্রীমন্দিরে নিয়ে গিয়ে তাঁ'র স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে নিয়ে এসে সকলকে তীর্থজলে স্নান করা'লেন ও বহুমূল্য অলঙ্কার এবং বেশভূষায় সকলকে ভূষিত করিয়ে রাজা আপনাকে ধন্য-জ্ঞান করিলেন !!! **সঙ্গে সঙ্গে** (**শ্রীমন্দিরের**) সর্ব্বত্র মঙ্গল-বাদ্য বাজিয়া উঠিল !!! ধন্য ভক্ত ও ভগবানের লীলা-মাহাত্ম্য !!!

অনন্তর, মহারাজ ভক্তকে শ্রীবিগ্রহ-সম্মুখে রাখিয়া পুত্র-পৌত্রাদি-ক্রমে তাঁহাকে উপাদেয় প্রসাদ পা'বার ও হিসাব-রক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত থাক্‌বার **আদেশ-পত্র** লিখে দিলেন !!!

মুখে মুখে ভক্তের "জয়ের কথা" নগর-ময় ছড়িয়ে পড়ল !! নির্য্যাতনকারীরা দলে দলে এসে ভক্তের কাছে কৃতাপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কর্‌তে লাগ্‌ল। অত লোককে একাকী তিনি সান্ত্বনা কি ক'রে দেবেন্ ? তাই, শুধু সম্মতি-সূচক নতশিরে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন !!! **ধন্য ভক্তের বিনয়** !!! আর, প্রভুর অপার করুণার কথা যতই তিনি মনে করেন্, ততই তাঁর দুই চোখ দিয়ে "দর-দর" ধারায় আনন্দাশ্রু গড়িয়ে

প'ড়তে লা'গল !!! ভগবানের কাছে এমন রকম বন্ধুত্বের দাবী ক'জন ক'রতে পারে? সাধু মহান্তীজী! তুমিই যথার্থ দীনের **বন্ধুকে** চিনেছিলে !! ধন্য তোমার ভক্তির মহিমা !!!

তা'র পর শত শত বৎসর কেটে গেছে! এখনও এই ভক্তচূড়ামণি মহান্তীজীর বংশধরেরা শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম-ধামের শ্রীমন্দিরে প্রভু জগন্নাথ-দেবের হিসাব-রক্ষক !!! এখনও এই ভক্ত মহান্তীজীর জয়-গানে প্রভু জগদ্বন্ধুর শ্রীমন্দির-দুয়ার নিত্য মুখরিত।

শ্রীশ্রী"ভক্ত-মহান্তীজীর" শ্রীচরণ-পদ্ম, দীনবন্ধুর সহিত আমাদের বন্ধুত্ব-লাভে, চির-সহায় হউক্।

শ্রীশ্রীরুইদাসের চরিত্র।

(ক) গুরু রামানন্দ স্বামীর এক ব্রহ্মচারী, ব্রাহ্মণ-শিষ্য গুরুর আদেশে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া নিত্য পাকাদি করিতেন ও গুরু সেই অন্ন-দ্বারা ইষ্টদেবের ভোগ দিতেন। এই ব্রাহ্মণ-শিষ্য আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিয়া নিত্য ভোগের জন্য মুষ্টিভিক্ষায় নিযুক্ত থাকিতেন।

এক মহাজন এই ব্রাহ্মণের মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহে একান্ত নিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার কাছে প্রতিদিন সিধা লইতে ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করেন, কিন্তু গুরুর আজ্ঞা ব্যতীত তিনি তাহা লইতে পারিতেন না।

একদিন হঠাৎ ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগ দেখিয়া ব্রাহ্মণ সেই মহাজনের নিকট হইতেই সিধা লইয়া যথাপূর্ব্ব ভোগান্ন পাক করিলেন—গুরু রামানন্দ এই অন্নের ভোগ দিতে গিয়া দেখিলেন "ইষ্ট-ধ্যানে তাঁহার মন নিবিষ্ট হয় না" !! ইহাতে গুরুদেব বিস্মিত হইয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! আজ কোথা হইতে ভিক্ষা আনিয়াছ?" শিষ্য বলিলেন "প্রভু, আজ দৈবদুর্ব্বিপাকে গ্রাম-গ্রামান্তরে মুষ্টিভিক্ষা-সংগ্রহে বিঘ্ন ঘটায় কোনো বণিকের নিকট ভিক্ষা লইতে হইয়াছে।" এই শুনিয়া গুরু বলিলেন "বিষয়ীর স্থানে ভিক্ষা গ্রহণ করিলে চিত্ত মলিন হয় এবং তোমার স্বধর্ম্ম "মুষ্টিভিক্ষা ভিন্ন সকলই তোমার পক্ষে যে অনাচার" এ কথা বারংবার বলিয়া দিয়াছি; ইহা সত্ত্বেও আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছ বলিয়া তোমাকে এই অভিশাপ দিলাম, যে তুমি অচিরাৎ দেহান্তে নীচকুলে জন্মগ্রহণ কর।"

তদনন্তর কালক্রমে সাধু রামানন্দের শাপে এই ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ এক মুচিকুল বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন; কিন্তু সদ্‌গুরুসঙ্গ ও তাঁহার সেবার বলে তিনি জাতিস্মর হইলেন। পূর্ব্বজন্মের সকল কথাই তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত থাকিল এবং জন্মমাত্র তাঁহার মনে হরিভক্তির উদয় হইল।

জন্মগ্রহণ করিতেই গুরুর বিচ্ছেদবেদনা তাঁহার মনে জাগ্রত হইল এবং ব্যাকুলভাবে তিনি দিবারাত্র ক্রন্দন করিতে লাগিলেন— তাঁহার পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন সকলেই তাঁহাকে দুগ্ধ পান করাইবার চেষ্টায় ব্যর্থ-মনোরথ হইলে তাঁহারা সকলে সাধু রামানন্দের নিকট গমন করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে নবজাত শিশুর অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন ও বহু মিনতি-পূর্ব্বক শিশুর মঙ্গল-কামনা করিলেন।

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীরামানন্দ স্বামী এই বৃত্তান্ত শুনিয়াই বুঝিলেন তাঁহার প্রিয়শিষ্যের জন্ম হইয়াছে এবং গুরু-বিচ্ছেদজন্যই শিশুর এই ভাবে ক্রন্দন ও দুগ্ধপানে বিরতি জন্মিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি কৃপাপরবশ হইয়া চর্ম্মকারকে বলিলেন "চল চল, আমি তোমার বাড়ীতে যাই— শিশুকে ভাল করিয়া দিব"। চর্ম্মকার ইহাতে কুণ্ঠিত হইয়া করযোড়ে বলিল "প্রভু! আমি অধম নীচ-জাতীয়, আমার গৃহ মহাজনের পদধূলিতে ধন্য হইবার যোগ্য নহে—সে জন্য আমি ভয়ে আকুল হইতেছি যে কি উপায়ে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে!!!" স্বামীজী বলিলেন "তোমার কোনো চিন্তা নাই—আমার মর্য্যাদাহানির কোনো কারণ নাই—"পরোপকারই প্রকৃত হরিসেবা" বলিয়া আমি জানি এবং ইহাই আমার স্বধর্ম্ম—এই ধর্ম্মপালনে আমার পক্ষে স্থানাস্থান ও কালাকাল বিচার নাই। চল চল, শীঘ্র যাই।"

এই বলিয়াই সাধু রামানন্দ তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন ও শীঘ্রই চর্ম্মকার-ভবনে উপনীত হইলেন এবং শিশুর সম্মুখীন হইতেই শিশুটী

তৃষিত চাতকের ন্যায় স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন ও দুনয়নে অশ্রুমোচন করিতে করিতে নীরবে হৃদয়বেদনা জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন।

স্বামী রামানন্দ শাপভ্রষ্ট শিষ্যের একনিষ্ঠ ভক্তির ভাব দেখিয়া কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে শিষ্যের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন "বৎস! কাতরতা পরিহার কর—আমি বলিতেছি—"কল্পতরু, ভক্তবৎসল শ্রীরামচন্দ্র অবশ্য এই জন্মেই তোমাকে অভয়পদছায়া দিয়া ধন্য করিবেন"—আমি এখন ফিরিয়া চলিলাম।" এই বলিয়া শিশুর কর্ণকুহরে পতিতপাবন **"রামনাম"** মহামন্ত্রদানে তাঁহাকে কৃতার্থ ও শান্ত করিয়া স্বামী রামানন্দ আপনার আশ্রমে ফিরিয়া গেলেন। এই ঘটনা সকলেই সন্দর্শন করিয়া ভক্তিরসে নিমগ্নচিত্তে সেই অগতির গতি রামচন্দ্রের নামগানে মহানন্দে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন ও অন্তিমে **পরমপদ** প্রাপ্ত হইলেন।

(খ) কালক্রমে শিশু রুইদাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার হৃদয়ে ভক্তিরসও দিন দিন শশীকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল—সতত সুমধুর রামনামগানে নিমগ্ন থাকিয়া মহানন্দে প্রতিদিন দুই জোড়া করিয়া পাদুকা তিনি নির্ম্মাণ করিতে থাকিতেন ও স্বজাতীয় কর্ত্তব্য-পালনের এই ফল হইতে নিত্য এক জোড়া পাদুকা বৈষ্ণব দেখিয়া দান করিতেন ও বৈষ্ণবের ছিন্ন পাদুকা দেখিলেই বিনা পারিশ্রমিকে তাহার সংস্কার করিয়া দিতেন—অন্য জোড়া পাদুকা বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে তিনি আত্মীয়-স্বজন ও কুটুম্ব হইতে বিযুক্ত হইয়া কোনো নদীতীরে এক পর্ণকুটীর স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে এক শালগ্রামশিলার স্থাপনা করিয়া গোপনে ইষ্টদেবতার পূজা-আরাধনা করিতেন। এই ভাবে তিনি দুঃখ কষ্টের

দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একান্ত মনে নিত্য-উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন। কোনো কোনো দিন স্বহস্ত-নির্ম্মিত জুতার গ্রাহক না পাইলে অর্থাভাবে তাঁহাকে উপবাসীও থাকিতে হইত।

দীনদয়াল রামচন্দ্র ভক্তের এইরূপ ক্লেশে কাতর হইয়া একদিন ছদ্মবেশে এক স্পর্শমণি আনিয়া রুইদাসকে বলিলেন "বৎস! আর কষ্ট করিও না, এই লও তোমার জন্য স্পর্শমণি আনিয়াছি—ইহার দ্বারা লৌহকে স্পর্শ করিতেই লৌহ স্বর্ণে পরিণত হইবে; ইহাতে তোমার বহু অর্থলাভ হইবে।"

এই শুনিয়া ভক্ত রুইদাস জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! কে তুমি এত দয়ালু? আপনার প্রকৃত পরিচয়দানে অধমকে কৃতার্থ কর।" প্রভু কহিলেন "বৎস! আমি তোমার ইষ্টদেবতা "স্বয়ং রঘুনাথ"; তোমার কষ্টে কাতর হইয়া তোমার দারিদ্র্যমোচন করিতে আসিয়াছি—ধর ধর, স্পর্শমাণিক গ্রহণ কর।"

এই শুনিয়া রুইদাস বলিলেন "প্রভু! আপনিই যদি আমার ইষ্টদেব "স্বয়ং রঘুবর" হন্ তবে প্রকৃত স্বরূপ দেখাইয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্। বৃথা পাথরের মাহাত্ম্য শুনাইয়া অধমকে ভুলাইয়া আপনার লাভ কি?"

প্রভু কহিলেন "প্রথমে এই মাণিক গ্রহণ কর, তা'র পর স্বরূপ দেখিবে"। এই বলিতে বলিতে প্রভু রুইদাসের চর্ম্ম কাটিবার অস্ত্রটী স্বহস্তের স্পর্শমণি দ্বারা ছুঁইতেই তাহা স্বর্ণে পরিণত হইল!!

রুইদাস এই দৃশ্যে প্রমাদ গণিলেন ও উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলেন "প্রভু! কে তুমি বৃথা আমার বিড়ম্বনা করিতে আসিলে? আমার নিত্য ব্যবহার্য্য লৌহাস্ত্রকে সুবর্ণময় করিয়া ইহার গুণ নষ্ট করিলে!! ইহারই সাহায্যে আমার দিনপাত হইত। প্রভু দয়া করিয়া তোমার ধন ফিরিয়া লইয়া যাও—আমার ইহাতে কোনো প্রয়োজন নাই।"

প্রভু ইহাতে জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! তোমার লৌহাস্ত্র সুবর্ণময় হওয়ায় অত্যধিক মূল্যবান্ হইল ও ইহাতে তোমার বিশেষ লাভই হইল—সকলে স্বীকার করিবে—তবে ইহা নষ্ট হইল কেন বলিতেছ?"

রুইদাস বলিলেন "প্রভু! বাহ্যতঃ এই স্বর্ণময় অস্ত্র লাভেরই বিষয় বটে, কিন্তু ইহা বিক্রয় করিলে যথেষ্ট অর্থলাভে আমার লোভ নিশ্চয়ই প্রবল হইবে এবং এই স্পর্শমণির সাহায্যে পুনঃ পুনঃ স্বর্ণলাভে আমার প্রভূত ধনসম্পত্তি লাভ হইবে। এই ধনসম্পত্তি হইতেই জীবের মনে অহঙ্কারের উৎপত্তি হয় এবং তাহা হইতেই জীবের **পরমার্থ**-বিষয়ে সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। তাই বলি, এই অর্থে আমার প্রয়োজন নাই—দয়া করিয়া দাসের সহিত ছলনা পরিহার-পূর্ব্বক এই সর্ব্বনাশী স্পর্শমণি ফিরাইয়া লইয়া যাও।"

তথাপি প্রভু রঘুনাথ তাঁহার ভক্তের সহিত আরও কিছু লীলা করিবার মানসে কোনো প্রকারে ছলনা করিয়া রুইদাসের নিকট স্পর্শমণি গচ্ছিত রাখিয়া প্রস্থান করিলেন!!

তাহার পর, ভক্তপ্রবর রুইদাস সেই স্পর্শমণি ও স্বর্ণময় অস্ত্র লইয়া ঘরের "চালে" তাহা গুঁজিয়া রাখিয়া আপনার পূর্ব্ব-অভ্যাস মত নিত্যকর্ম্মে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিত্য-কর্ত্তব্যের জন্য আর একটী চর্ম্ম কাটিবার লৌহাস্ত্র নির্ম্মাণ করাইয়া লইলেন!!!

যে মহাজনের মন সর্ব্বদা **নিত্যধনের** প্রেমানন্দ-সাগরে নিমগ্ন, শুধু স্পর্শমণি কেন—ত্রৈলোক্যের আধিপত্য, এমন কি অষ্টাদশ সিদ্ধিও, তাঁহার কাছে লোভনীয় নহে। ভক্তচূড়ামণি রুইদাসের জীবনের এই আখ্যায়িকায় প্রকৃত ধর্ম্মজীবনের মূলমন্ত্র যে ঐহিক বিষয়ে সম্পূর্ণ লোভশূন্যতা তাহার স্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

(গ) কিছুকাল পরে ছদ্মবেশধারী প্রভু রামচন্দ্র, ভক্ত শিষ্য রুইদাসের সমীপে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বৎস! আমি তোমাকে যে স্পর্শমণি দিয়া গিয়াছি তাহা কোথায় রাখিয়াছ"? রুইদাস বলিলেন "হাঁ প্রভু! তোমার পাথর ও স্বর্ণময় লৌহ উভয়ই ঘরের "চালে" গুঁজিয়া রাখিয়াছি—এখনই বাহির করিয়া দিতেছি, লইয়া গিয়া অন্য কোনো দুঃখীকে দান কর।" প্রভু বলিলেন "সেজন্য তোমার কোনো চিন্তা নাই—ভাল! স্পর্শমণি যদি গ্রহণ না কর, ক্ষতি নাই, আমি তাহা অন্য কাহাকেও দিব; কিন্তু, তুমি সামান্য কিছু আমার নিকট না লইলে আমি কোনো মতে তোমাকে ছাড়িব না; তাই বলি, শোনো—তোমার শালগ্রাম ঠাকুরের আসনের তলে নিত্য প্রাতঃকালে পাঁচটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা পাইবে—তাহাই তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। চল চল, দেখিবে চল।"

প্রভুর সহিত রুইদাস আপনার কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বাস্তবিকই তাঁহার প্রিয় শালগ্রাম-ঠাকুরের আসনের তলে পাঁচটী স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে!!!" এই দেখিয়া রুইদাস জিজ্ঞাসা করিলেন "প্রভু! বাস্তবিক তুমি কে এবং তোমার স্বরূপই বা কি আমাকে দয়া করিয়া বল এবং কি হেতুই বা তুমি এই অধমের জন্য এত বেশী ভাবিতেছ?" প্রভু বলিলেন "বৎস! আমিই তোমার চির-বাঞ্ছিত "স্বয়ং রামচন্দ্র"—তোমার ন্যায় ভক্তের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয়ে অসহ্য দুঃখের উদ্ভব হয়, আমি স্থির থাকিতে পারি না; সেই জন্যই তোমার দারিদ্র্য-দুঃখ মোচন করিতে বারম্বার তোমার কাছে আসিতেছি। এখন অঙ্গীকার কর—প্রত্যহ প্রাতে তোমার শালগ্রাম ঠাকুরের আসনের তল হইতে আমার প্রদত্ত পাঁচটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া অভাব-মুক্ত হইবে।" রুইদাস বলিলেন

"প্রভু! তাহা হইলে দয়া করিয়া স্বরূপ দর্শন করাইয়া অধমের হৃদয়ে প্রতীতি উৎপাদন করুন, আমি কৃতার্থ হই।"

এই স্বীকারোক্তি শুনিয়াই প্রভু রামচন্দ্র নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভক্তকে দর্শন দিয়াই চকিতে অন্তর্হিত হইলেন!!! ইহাতে সাধু রুইদাস স্তম্ভিত হইয়া চমৎকার-চিত্তে হতজ্ঞানপ্রায় স্থাবরের ন্যায় নির্ণিমেষ-নয়নে শূন্যপানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেকের তরে চেতনা পাইলেই ইতস্ততঃ চারিধারে তাঁহার "গুণনিধিকে" খুঁজিতে থাকেন ও দেখিতে না পাইয়া বিভ্রান্তচিত্তে ও অনুতপ্ত হৃদয়ে চতুর্দ্দিকে উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিতে ঘুরিতে এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন—"হায় হায়! নবঘনশ্যাম, দুর্ব্বাদলনিন্দিত, পীতাম্বর শ্যামসুন্দরের কি অপরূপ নয়নরঞ্জন মূর্ত্তি ক্ষণেকের তরে দেখিয়া সে পরম রত্ন হইতে সহসা বঞ্চিত হইলাম!!! হায় হায়! প্রভু যে আমার চিরবাঞ্ছিতধন "স্বয়ং রঘুমণি" এ কথা বারম্বার শুনিয়াও আমার মনে প্রত্যয় জন্মে নাই!! যদি জানিতাম, তাঁহার শ্রীচরণ ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিতাম—কখনো ছাড়িয়া দিতাম না!! এই অবিশ্বাসজনিত মহাপাপেই আমাকে এই বিরহযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল!! হায় হায়! দুর্দ্দৈব আমার! আমি একি মহাভুল আচরণ করিয়া বসিলাম!!"

এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে একটু স্থিরচিত্ত হইলে সাধু রুইদাস বিচার করিলেন "এখন তো আর কোনো উপায় নাই—তাঁহার আদরের দান "স্বর্ণমুদ্রাগ্রহণের প্রতিজ্ঞা-রক্ষা" ভিন্ন আর আমার গতি কি আছে" এইরূপ স্থির করিয়া সাধু রুইদাস তাঁহার আরাধ্য দেবতা "রঘুনাথের" নিত্য-দান-স্বরূপ পাঁচটী করিয়া স্বর্ণমুদ্রা লইয়া তাঁহার মন্দিরে ঠাকুরের যথারীতি সেবার ব্যবস্থা করিলেন এবং বহু বৈষ্ণব ভক্তসহবাসে সর্ব্বদা "কৃষ্ণকথা"-আলোচনা ও গীতিবাদ্যসহ

মহোৎসবরঙ্গে প্রভুর নাম-কীর্ত্তনানন্দে কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই ভক্ত-নিবেদিত ভোগান্ন শ্রীশ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং প্রত্যহ ভোজন করিলে ভক্তবৃন্দ সকলে মহানন্দে প্রসাদ পাইতেন।

ভক্তের সহিত ভগবানের লীলারঙ্গ যে কত চমৎকার তাহা সাধু রুইদাসের চরিত্র-পাঠেই সহজে সুধীবৃন্দের অনুভাবনীয়!

(ঘ) কালক্রমে সাধু রুইদাস কাশীধামের নিকট কোনো স্থানে কিছুকাল বাস করিবার সময় "সীতা-ঝালি" নামে কোনো রাণী তাঁহার নিকট দীক্ষা-গ্রহণের মানসে উপস্থিত হন্। এই রাণী দীক্ষাগ্রহণ করিবার জন্য বহুকাল ধরিয়া গুরু-অন্বেষণ করিতেছিলেন। কিন্তু, কেবলমাত্র নামধারী বহু গুরুদিগকে পরীক্ষা করিয়াও সন্তুষ্টি-লাভ করিতে না পারায় গুরু-করণের আশায় তিনি জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। শেষে, ভাগ্যক্রমে ভগবৎকৃপায় হঠাৎ একদিন তিনি কোনো সূত্রে পরমভাগবত সাধু রুইদাসের নাম শুনিয়া অতি শুদ্ধ-ভক্তিভাবে তাঁহার শ্রীচরণে উপস্থিত হইলেন ও কেবল সাধুকে দর্শনমাত্রেই তাঁহার মন শ্রদ্ধা ও ভক্তিরসে নিমগ্ন হইল—তিনি তাঁহারই সেবিকা হইতে উদ্যত হইলেন।

এই দেখিয়া তার্কিক ব্রাহ্মণগণ রাণীকে শাস্ত্র বুঝাইয়া বলিলেন "রাণীমা! মুচির সন্তানের নিকট পরম মহীয়সী আমাদের "মা" হইয়া আপনি দীক্ষা-গ্রহণ করিবেন—ইহা হইতে লজ্জার কথা আপনার এই সন্তানদিগের পক্ষে আর কি থাকিতে পারে? মা! আমাদের মিনতি রক্ষা করুন্—ধর্ম্মবিরুদ্ধ, অবজ্ঞাজনক আপনার এই দীক্ষা-গ্রহণের সংকল্প পরিবর্জ্জন করুন্।"

এই শুনিয়া সুপণ্ডিতা বুদ্ধিমতী রাণী বলিলেন "বৎসগণ! তোমরা বৃথা উদ্বেগ ও অহঙ্কার পরিত্যাগ কর; আচ্ছা! তোমরা আজন্ম লৌকিক সংস্কার ও আচার-প্রণালীর অধীন থাকিয়া কেবল

যন্ত্রের মত যেরূপ গতানুগতিকভাবে ব্রহ্মানুষ্ঠান করিয়া আসিয়াছ, বল দেখি বাবা! আপনার মুক্তির জন্য কি বিধান করিয়াছ? সাধুকে যে তোমরা নীচ বলিতেছ ইহা অতি অনুচিত বুঝিবে—শাস্ত্রের দোহাই ছাড়িয়া দাও, সাধারণ বুদ্ধিতে বিচার করিয়া দেখ; প্রভুকে যিনি সতত হৃদয়ে ধারণ করেন তাঁহাকে নীচ বলিলে মিথ্যা-জনিত পাপ স্পর্শে, যেহেতু "হরিভক্ত" নীচজাতীয় হইলেও হরিনামের গুণে তাহার পুনর্জন্ম হয় না; কিন্তু, স্বাভাবিক ও তথাকথিত ব্রাহ্মণগণ হরিভক্তিবিহীন হইয়া পুনঃ পুনঃ নীচকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে; যেহেতু, তাহাদের মনের গতিই নীচ বিষয়বুদ্ধির দিকে! এই বিষয়ে চিন্তা করিলেই তোমরা বুঝিবে তোমাদের ধারণা অতীব ভ্রান্তিমূলক।"

এই সমস্ত বলিয়াই শ্রীমতী রাণীজী সাধু রুইদাসের শ্রীচরণে শরণ লইয়া "রামনাথ মহামন্ত্রে" দীক্ষিত হইলেন ও বহুজন্মের ভাগ্যফলে অভীষ্ট দেবতার দর্শনলাভে ধন্য হইলেন।

এদিকে, বিদ্বেষী ব্রাহ্মণগণ রাণীকে আর কিছু বলিতে সাহস না করিয়া পরস্পর পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন "রাণী আগতপ্রায় নাম-মহোৎসবে যখন তাঁহাদের নিমন্ত্রণ করিবেন সেই সময়ে নিশ্চয়ই তাঁহারা রুইদাস যেখানে থাকিবেন তাহার বহুদূরে পংক্তি-ভোজনে বসিবেন।" কালক্রমে মহোৎসবদিবসে ব্রাহ্মণগণ যখন এক পংক্তিতে ভোজনে বসিয়াছেন সেই সময় রাণীজী স্বয়ং তাঁহার গুরুদেব রুইদাস সাধুকে হস্তে ধরিয়া তথায় লইয়া আসিলেন ও তাহাকে ব্রাহ্মণগণের পংক্তির নিকট সেবার জন্য আসনে বসাইয়া চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মণগণ ইহাতে প্রমাদ গণিয়া সকলেই ক্রমশঃ সরিয়া সরিয়া পৃথক্ পৃথক্ দূরে দূরে বসিলেন। পরিবেষন শেষ হইলে যখন সকলে ভোজনে তৎপর তখন সকলেই পরস্পর দেখিতে লাগিলেন সকলেরই

পাশে স্বয়ং সেই রুইদাস সাধুও একত্র বসিয়া ভোজন করিতেছেন !!! এই দৃশ্যে তাঁহারা সকলে হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন !!!

আহারান্তে স্বয়ং রাণীজী গুরুদেবকে স্বর্ণসিংহাসনে বসাইয়া চামর ব্যজন করিয়া তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণগণ তখন বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছেন "সাধুর স্কন্ধোপরি স্বর্ণযজ্ঞোপবীত সুশোভিত এবং তাঁহার শ্রীঅঙ্গের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে সেই স্থান প্রতিভাসিত !!!" ইহা দেখিয়াও দাম্ভিক ব্রাহ্মণগণ প্রকাশ্যে কিছু উচ্চবাচ্য না করিয়া ধীরভাবে ও নীরবে স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

প্রভু জগন্নাথদেব কত ভাবে যে নিজ ভক্তের মহিমা প্রকাশ করিতে লীলা করিয়া থাকেন তাহা শুষ্ক জ্ঞানমার্গী, অভিমানী বিপ্রগণ জানেন না। অতি ভাগ্যবান্ না হইলে প্রকৃত বিষ্ণুভক্ত যে কত মহান্ তাহা জানা যায় না। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবানই শ্রীমুখে বলিয়াছেন—

"বিনা ভক্তপূজা কৃষ্ণপূজা নহে সিদ্ধ।
ভক্তপূজা কৈলে কৃষ্ণ হৃদে হয় বদ্ধ॥"

অন্যত্র ভগবান্ বলিতেছেন :—

"নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র বসামি নারদ॥"

যাবতীয় চর্ম্মকার-সম্প্রদায় অদ্যাপি এই সাধু রুইদাসের উপাসক এবং প্রতি সন্ধ্যায় চর্ম্মকার-ভক্তগণ অশেষ ভক্তিভরে তাঁহার রচিত প্রেমভক্তিপূর্ণ "রামনাম"-গীতাবলি কীর্ত্তন করিয়া ধন্য হইয়া আসিতেছেন।

শুদ্ধাচারিণী, পরম ভক্তিমতী এই "ঝালি"
রাণীজীর শ্রীচরণপ্রসাদে সাধু রুইদাস
সংসারতাপদগ্ধ বিষয়কূপে নিমগ্ন
আমাদের একমাত্র ভরসা হউক্।

শ্রীশ্রীলালাচার্য্যের চরিত্র।

অতি গুরুভক্ত, শুদ্ধমতি, পরম বৈষ্ণব শ্রীশ্রীলালাচার্য্য প্রসিদ্ধ রামানুজ স্বামীর জামাতা; গুরু-বাক্যে তাঁহার অশেষ নিষ্ঠা ও প্রতীতি ছিল। গুরু তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন যেন তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব-মাত্রকেই গুরুর গুরু এবং পরমাত্মীয়ভাবে ভাবনা করিবার অভ্যাস করেন; এ হেন বৈষ্ণবের দোষ-গুণ যেন তিনি কখনও বিচার না করেন; সহোদর ভ্রাতার ন্যায় সর্ব্বদা প্রীতিপূর্ব্বক যেন তাঁহার হিতচেষ্টায় নিযুক্ত থাকেন। শ্রীমান্ লালাচার্য্যও গুরুবাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া বৈষ্ণব-চরণে একান্ত ভক্তিমান রহিলেন।

দৈবযোগে একদিন তিনি নদীবক্ষে বৈষ্ণব-চিহ্নাঙ্কিত এক মৃতদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখেন - এই দৃশ্য দেখিয়াই তাঁহার হৃদয়ে কারুণ্যের সঞ্চার হইল—তিনি তখন এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন "আহা! এই বৈষ্ণব ভ্রাতার কিরূপে মৃত্যু ঘটিল কে জানে? নদীবক্ষে শব ভাসিয়া যাইতেছে, কেহ ইঁহার সদ্গতি করে নাই!" এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে তিনি অশ্রুপূর্ণ নয়নে মৃতদেহটীকে নদী হইতে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া তাহার যথারীতি সৎকার করিবার জন্য গৃহে লইয়া গেলেন।

গৃহে আসিয়া তিনি মৃতদেহকে পুষ্পশয্যায় শায়িত করিয়া নামসঙ্কীর্ত্তনের সহিত নদীতটে তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন ও গৃহে ফিরিয়া আসিলে মিষ্টান্ন, পক্বান্ন প্রভৃতি বহু আয়োজনের সহিত নাম-মহোৎসবের ঘোষণা করিয়া ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও আত্মীয়-স্বজনদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। কিন্তু, অজ্ঞাত-

কুলশীলের মৃতদেহের সৎকার বলিয়া কেহই জাতিনাশ-ভয়ে নিমন্ত্রণে যোগদান করিলেন না; অধিকন্তু, শ্রীমান্ লালাচার্য্যের এই অনুষ্ঠান ধর্ম্ম ও সমাজগর্হিত বলিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। অন্তরঙ্গ বৈষ্ণব সঙ্গিগণও লোকলজ্জা ভয়ে এই মহোৎসব হইতে দূরে অবস্থান করিলেন।

বৈষ্ণবের ক্রিয়া ও মুদ্রা অতীব দুর্জ্ঞেয়! সকলে এই প্রকৃত বৈষ্ণব সাধু শ্রীমান্ লালাচার্য্যের চরিত্রের উপেক্ষা করায় ক্ষুণ্ণমনে তিনি গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। গুরু কহিলেন "বৎস! তোমার চরিত্রের মহিমা এই সকল অহঙ্কারী, তত্ত্বজ্ঞানহীন লোকেরা না বুঝিয়া যে পরম রত্ন হারাইল সে বিষয় তাহারা সকলই অচিরে বুঝিয়া অনুতপ্ত হইবে। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই—তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরিয়া যাও।"

সাধু লালাচার্য্য গুরুবাক্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া গৃহে ফিরিতেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া ভক্তিরসে রোমাঞ্চিত হইলেন—বাস্তবিকই গ্রামের ভদ্র ও অভিমানী সকলেই এই অপ্রাকৃত দৃশ্য দেখিয়া অপরাধভয়ে চমকিত হইল—কোথা হইতে তেজঃপুঞ্জ-কলেবর শত শত অজ্ঞাত বৈষ্ণবের শুভাগমন, নামসংকীর্ত্তন ও মহোৎসবরঙ্গে আজ দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত! পরম পরিতোষের সহিত তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভোজনানন্দ দেখিয়া আজ সকলে স্তম্ভিত!!

এই ঘটনার পর গ্রামের সকলেই অপরাধভয়ে সাধু লালাচার্য্যের শ্রীচরণে আশ্রয় লইল। সাধু বলিলেন "তোমাদের কোনো ভয় নাই—বৈষ্ণব মহাজনদিগের উচ্ছিষ্ট সেবন কর, সকল দুঃখের অবসান হইবে; বৈষ্ণব চরণের বন্দনা কর, পরমানন্দ সাগরে বিহার করিবে এবং দেহান্তে **পরম পদ** প্রাপ্ত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া সকলে সেই বৈষ্ণব-মহাজনগণের উচ্ছিষ্ট ভক্তিভরে সেবন করিতেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সকল অভিমান ও দম্ভ দূরীভূত হইল এবং আচার্য্য লালাচার্য্যের কৃপাদৃষ্টিতে তাঁহাদের হৃদয়ে পরাভক্তির বিকাশ হইল এবং সাধুসঙ্গের অমৃত ফলের অস্বাদন করিয়া সকলে ধন্য হইল।

প্রভু লালাচার্য্যের শ্রীচরণ কৃপায় মোহগ্রস্ত আমাদের সকল অহঙ্কার ও দম্ভের অবসান হউক।

শ্রীশ্রীগুহরাজার চরিত্র।

ভুবনপাবন শ্রীশ্রীগুহ নামে চণ্ডালরাজের স্মরণ-মাত্রেই তাপত্রয়ের মোচন হয়। তাঁহার প্রসঙ্গফলে অতি দুর্লভ ভক্তি-রত্নের প্রাপ্তি সুলভ হয়। স্বয়ং করুণাময়, সীতাপতি রামচন্দ্র সৌজন্যবলে বাধিত হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হন্ ও তাঁহাকে দৃঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে ধরিয়া অপার আনন্দ লাভ করেন্!!! শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রিয়তম বলিয়া জগতের সকল বাঞ্ছনীয়-মধ্যে তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ এবং ভগবদ্ভক্তদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য গণিয়া ভক্তিপরায়ণ, পরম ভাগ্যবান্ পণ্ডিতগণ তাঁহার পূজা করিয়া ধন্য হন্। তাঁহার চরিত্র--শ্রবণে হৃদয় আনন্দ-শিহরণে নাচিয়া উঠে এবং দুর্লভ মনুষ্য-জন্ম সফল হয়। তাঁহারই একান্ত প্রেম-ভক্তিপূর্ণ চরিত্র এখানে বর্ণনীয় ঃ—

রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র যখন পিতৃসত্য-পালনের জন্য সাধ্বী প্রেয়সী সীতাদেবী ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনগমন করেন্ সেই সময়ে বনমধ্যে তিনি চণ্ডাল-বংশপাবন শ্রীশ্রীগুহরাজের সৌজন্যবলে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন।

সকল সৌন্দর্য্যের আধার, গুণমণি রামচন্দ্রকে দেখিয়াই শ্রীশ্রীগুহ-রাজের মনে স্বাভাবিক রতি-ভক্তির উদয় হইল! এ হেন পরম সুন্দর রামচন্দ্র-দর্শনে প্রেমোন্মত্ত হওয়ায় তাঁহার দু-নয়নে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। নির্ণিমেষ-নয়নে নির্ব্বাক্ হইয়া কেবল সেই অপরূপ রূপরাশি তিনি দর্শন করিতে থাকেন; বিনয়ের ভারে তাঁহার মস্তক হইতে সর্ব্বাঙ্গ অবনত! শেষে, ধীরে ধীরে সাধু গুহরাজ তাঁহার নিকটে গিয়া বলেন্ "আহা, আহা! এমন ননীর পুতলী তুমি! কোথা হ'তে ঘোর কণ্টকিত, নিশাচর ও হিংস্রপশু-বেষ্টিত,

শীত-বাত ও বৃষ্টি-সমাকুল এই মহারণ্য-মাঝে কমলিনী-নিন্দিত সুকুমারী পত্নী ও সুকুমার-দেহ অনুজের সঙ্গে আসিয়া পড়িলে !! প্রতি পাদক্ষেপে তোমাদের কোমল পদে কণ্টক বিন্ধিবে। আহা ! মরি মরি ! তোমাদের সে দুঃখ আমার প্রাণে সইবে না ! আমি তোমাদের সকল বালাই নিয়ে মরি ; তোমরা পরম সুখে আমার ঘরে বাস কর; আমাকে তোমাদের দর্শনসুখে ধন্য হইতে দাও।"

প্রভু রামচন্দ্র ভক্তের এই কাতরতা দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়া "বন্ধু, বন্ধু !" বলিয়া সম্ভাষণ করিতেই শ্রীশ্রীগুহরাজের হৃদয় পরমানন্দের বেগভরে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ! তিনিও প্রভু রামচন্দ্রকে বলিলেন "ভাল, ভাল, ঠাকুর ! তুমিই আমার প্রকৃত বন্ধু, তোমাতেই আমি দেহ-প্রাণ সমস্ত অর্পণ করিলাম ; ভুক্তি, মুক্তি, শুভকার্য্য—এমন কি, রাজ্য, ধন, দেহ-প্রাণ যা' কিছু আছে, আমার সর্ব্বস্ব "তুমি" স্বয়ং ! আমার পরিবার, দেহ, গৃহ, রাজ্য, ধন—সকলই তোমার শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম—গ্রহণ করিয়া দাসকে ধন্য কর প্রভু !"

এই বলিয়াই ভক্ত গুহরাজ নানাবিধ বন্যফল, দধি, দুগ্ধ, পায়স প্রভৃতি উপাদেয় ভোজ্যের নানা আয়োজন করিয়া তাঁহার প্রাণনাথ রামচন্দ্রকে প্রীতিভরে নিবেদন করিলেন। প্রভু ইহাতে ভক্তকে বলিলেন "না, গো ! বন্ধু, না ! এ রকম বিবিধ ভোজ্যে আমার আর অধিকার নাই। বিশেষ প্রতিজ্ঞা-অনুযায়ী ১৪ বৎসর যাবৎ বনবাসে মাত্র ফলমূল ভিন্ন অন্য সকল খাদ্য-গ্রহণে আমার বিষম বাধা আছে। এই সময় উত্তীর্ণ হ'লেই তোমার এই পরমামৃত-স্বরূপ ভক্তি-নিবেদন গ্রহণ ক'রে সুখী হ'ব —সেজন্য কিছু মনে কোরো না।"

এই শুনিয়াই গুহরাজ নানাবিধ সুমিষ্ট ফলমূলের আয়োজন করিয়া প্রভুকে সেবা করাইয়া প্রেমানন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন !!! তা'র পর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বন্ধু আমার ! এ হেন নবীন বয়সে জটা-বল্কল ধারণ ক'রে কি হেতু তুমি বনগমন করিবে জিজ্ঞাসা করি, বল তো ! তোমরা সকলেই ননীর পুতলী, বনবাস-ক্লেশ তোমরা কেমনে সহ্য করিবে? আহা মরি ! "তোমাদের কত যে কষ্ট হ'বে" জান না ! এই সমস্ত ভেবে আমার প্রাণ ফেটে উঠ্‌ছে ! না, না, বন্ধু আমার ! বনবাসের সংকল্প পরিহার কর—আমার এই রাজ্য, ধন-সম্পৎ সমস্ত নিয়ে তোমার অনুজ লক্ষ্মণ ও আমার মাতৃঠাকুরাণী সীতাদেবীর সহিত তুমি এখানেই অবস্থিতি ক'রে আমাকে ধন্য কর।"

ইহাতে সীতাপতি রামচন্দ্র বলিলেন "তোমার সকল কথাই বুঝ্‌লাম বন্ধু ! কিন্তু তা' যে আমি রাখ্‌তে পারি না ! পিতৃসত্য-পালনের জন্য চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিবার জন্য আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছে—এই সময়ের মধ্যে কাহারও গৃহে বাস কিম্বা কোনও রূপ ঐশ্বর্য্য-ভোগে আমার ধর্ম্ম-অনুযায়ী যে অধিকার নাই ! কোনও সময়ে দেবাসুর-সংগ্রামে আমার পিতৃদেব অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইলে বিমাতা কৈকেয়ী ঠাকুরাণীর সেবা-শুশ্রূষায় তিনি সুস্থ হইয়া প্রসন্ন মনে তাঁহাকে দুইটী বর-দানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এখন পিতৃদেব বৃদ্ধ হওয়ায় জ্যেষ্ঠপুত্র আমাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হন্—তাহাতে মাতা কৈকেয়ী তাঁহার দাসী "কুব্জা মন্থরার" মন্ত্রণায় সেই দুইটী পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত বর প্রার্থনা করিয়া প্রথম বরে তাঁহার একমাত্র পুত্র ও আমার প্রিয় ভ্রাতা "ভরতকে" রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন ও দ্বিতীয় বরে চতুর্দ্দশ বৎসর যাবৎ আমার বনবাস কামনা

করিলেন। কাজেই, পিতৃসত্য-পালনরূপ পরম ধর্ম্ম আচরণ করিতে আমি স্বেচ্ছায় বনবাস বরণ করিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি; কেবল স্নেহ ও প্রেমের আধিক্য-বশতঃ অনুজ লক্ষ্মণ এবং প্রাণপ্রিয়া জনকনন্দিনী আমার অনুগমন করিতেছে !!! অতএব, তুমি আমার এই অবস্থার গুরুত্ব অবধারণ কর এবং তোমার অনুরোধ-রক্ষায় আমাকে অক্ষম বুঝে কিছু মনে কোরো না।"

প্রভুর বনগমনের এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে ভক্ত-চূড়ামণি গুহরাজের শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ ঝরিতে লাগিল !!! প্রচণ্ড ক্রোধের আবেশে, আরক্ত-লোচনে, কম্পান্বিত-দেহে লাফাইতে লাফাইতে তিনি সৈন্যদিগকে রণসজ্জার জন্য আহ্বান করিয়া বলিলেন "শোনো শোনো! প্রিয় সৈন্যগণ আমার! গুণমণি আমার বন্ধু **রামচন্দ্রকে** বঞ্চনা করিয়া দুষ্ট **ভরত** তাঁহার রাজ্য হরণ করিল! শেষে তাহাতেও তৃপ্ত না থাকিয়া কোমলমতি, সুকুমার বন্ধুকে আমার জটা-বল্কল পরাইয়া সে বনে পাঠাইল !!! আমার প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি এ হেন দারুণ অবিচার ও অত্যাচার আমার দুঃসহ !!! চল, চল! এখনই আমরা সেই কপটীকে ভীম বিক্রমে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বন্ধুকে আমার হৃত রাজ্যের অধিকারী করি, চল। সাজ, সাজ! এখনই আমার সঙ্গে মরণের উন্মাদনায় অযোধ্যার দিকে এগিয়ে পড় !!!" এই বলিতে বলিতেই চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া ভক্তশ্রেষ্ঠ গুহরাজ ভীষণ ক্রোধে রণোন্মাদনায় ভীম-বিক্রমে অযোধ্যার অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন্ !!

রঘুকুলমণি রামচন্দ্র তাঁহার ভক্তকে নিবারণ করিবার সামান্য অবসর পর্য্যন্ত পেলেন্ না !!! ভক্তের উন্মাদনা দেখিতে দেখিতে সর্ব্ব-সহিষ্ণু "রঘুমণি" স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া ছিলেন !!! অগত্যা

শেষে সেবক-শ্রেষ্ঠ, সুমিত্রানন্দন অনুজ লক্ষ্মণকে তিনি গুহরাজের অনুধাবন-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া সান্ত্বনা-বলে ফিরাইয়া আনিতে পাঠাইলেন। রণচতুর, সর্ব্বকৌশল-বিশারদ লক্ষ্মণও তদনুযায়ী যুদ্ধমুখী গুহরাজকে অবিলম্বে পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া গুণমণি অগ্রজের সম্মুখে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন !!!

তখন সর্ব্বগুণাকর, প্রভু রামচন্দ্র তাঁ'র বন্ধু গুহরাজের' হাতে ধ'রে তাঁ'কে পাশে বসিয়ে কত বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল্‌লেন্ "বন্ধু ! বিপদে কি এত অধীর হ'তে আছে ? বিপদে ধৈর্য্যধারণ এবং সম্পদে দোষীকে ক্ষমা করাই তো মহাপুরুষ বীরের চিহ্ন !!! কাজেই, ভাই ! এখন কি আমাদের অধীর হওয়া উচিত ? আমি বেশ জানি, আমাকে তুমি খুব ভালবাস ব'লেই তোমার মন আমার দুঃখে এত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে ; কিন্তু তা'হ'লেও আমাদেরকে ধর্ম্মের দিকেই আগে তাকিয়ে সকল দুঃখ সইতে হ'বে ; তা'হ'লেই দেখো "শেষে আমরা কত সুখী হ'ব" ! আবার ভেবে দেখ, **ভরতকে** আমি কত ভালবাসি—আমাকেও সে প্রাণের অধিক ভালবাসে—আমার বনবাসের অন্তে আমারই অপেক্ষায় সে বিরহ-কাতর হ'য়ে আমার পায়ের "খড়ম"-জোড়াকে রত্নসিংহাসনে রেখে সতত অশ্রুজলে তা'র পূজা করিতেছে ! তা'র কিম্বা আমার পিতা-মাতা কাহারও কোনো দোষ নেই জেনো—সকলই দৈবের বলে ঘটিয়া থাকে !!! লক্ষ্মী বন্ধুটী আমার ! কাতরতা পরিহার কর, শান্ত হও—কোনো চিন্তা কোরো না—"আবার আমি অচিরে ফিরে এসে আমার প্রিয় অযোধ্যাভূমির রাজা হ'ব"—তুমি চোখে দেখে সুখী হ'বে। আত্মসম্বরণ কর ভাই !"

ভক্তশ্রেষ্ঠ গুহরাজ সান্ত্বনা-লাভে প্রকৃতিস্থ হইলে পর ভক্ত-বৎসল রামচন্দ্র তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া গভীর দণ্ডকারণ্যের

মধ্যে অগ্রসর হইলেন। পাছে দয়ার ঠাকুর রামচন্দ্রের মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে গুহরাজ বহু কষ্টে কিছুকাল আত্ম-সম্বরণ করিয়া রহিলেন! এদিকে, প্রভু রামচন্দ্র বিদায় লইয়া প্রস্থান করিবার পরেই "রাম"-ময় জীবিত গুহরাজ ভূমিতলে হতচেতন হইয়া পড়িলেন!! তাঁহার সহিত রাজ্যের সকলেই ভীষণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল!! সমবেত ক্রন্দনের মহাকোলাহল-শব্দে মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিল!!!

বুকে কর হানি কেহ ভূমে গড়ি যায়।
"হাহাকার" করিয়ে লুণ্ঠয়ে গুহরায়॥
অহো! কিবা অনুরাগ চণ্ডালের গণে।
তা' সবার দাস হ'তে ইচ্ছা হয় মনে॥

লৌকিক আচারে ও কর্ম্মসূত্রে "চণ্ডাল"-নাম হীন বটে; কিন্তু, মহাভারতে আছেঃ—"চণ্ডাল যদি হরিভক্তি-পরায়ণ হয় সেও দ্বিজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং দ্বিজ যদি হরিভক্তি-হীন হয় তাহাকে চণ্ডালেরও অধম জানিবে।" যথাঃ—

"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহানস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ"॥

প্রভু রামচন্দ্র-বিচ্ছেদে ভক্ত গুহরাজের (আজ) এ কি দুর্দ্দশা দেখ! তিনি গৃহে না ফিরিয়া আসন, বসন, শয্যা, আহার-বিহার সমস্ত পরিহার-পূর্ব্বক কেবল-মাত্র "রামনাম" সার করিয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন!! "পুনরায় কতদিনে নয়নাভিরাম রামচন্দ্রের শুভাগমন হইবে" এই ভাবিয়া দিন-গণনা করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসরকে চতুর্দ্দশ যুগ মনে করিয়া তাঁহার দুই নয়নে নিরন্তর অশ্রুধারা বহিতেছে!!! কখনো কখনো শ্রবণসুখদ, সুধাময় "রাম"-নাম উচ্চারণে গুহরাজ কাঁদিতে থাকেন!!! যে দিকেই দৃষ্টিপাত করেন সাধু গুহরাজ ভাবের ঘোরে সেই দিকই—দুর্ব্বাদল-

শ্যাম "রাম-ময়" নিরীক্ষণ করেন্ !!! কখনো কখনো বা নিরাশার তপ্তশ্বাসে এই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠেন্ ঃ—

"রাম রাম ! মিতা মোর !" সখা মোর আয়্ !
দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ্, নহে বুঝি যায়্ !!!

এই ভাবে পূর্ণ চতুর্দ্দশ বৎসর ভক্ত গুহরাজ রাম-বিরহে সকাতরে বিহ্বল হইয়া—

কভু হাসে, কভু কাঁদে, কভু গান গায় !
(তাঁকে) কভু বা ভাবেতে দে'খে বলে "আয়্ আয়্" !!

এই বার, চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইবার দিনে অপরাহ্ন-কাল উত্তীর্ণ হইয়া আসিল !! কিন্তু, কই ? ভক্তের প্রাণারাম রামচন্দ্রের এখনো দেখা নেই কেন ? ভক্তের অন্তর সঙ্গে সঙ্গে তখন কত ব্যাকুল হইয়া উঠিল দেখ !

"কহে, মোর প্রাণনাথ "রাম" না আইল !
তবে এই ছার দেহ রাখি কিসে বল ?
অগ্নিতে প্রবেশ করি' নাশি এই দেহ !
আর যে সহিতে নারি "রামের" বিরহ !!"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি লেলিহান অগ্নিকুণ্ড-মধ্যে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেই—

শ্রবণ-মঙ্গল ধ্বনি "রাম-নাম" বাণী !
আকাশ হইতে আ'সে, চমকিত শুনি' !!!

ভক্ত গুহরাজ তখনই অধীর হইয়া আত্মীয়স্বজন ও অনুচরবর্গকে ডাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—

(ওগো !) দেখতো, দেখতো ! সবে, সুমধুর ধ্বনি।
"রাম"-নাম কোথা হ'তে শুনিনু এখনি !!!

দেখতো, দেখতো, তোমরা! এই চিরবাঞ্ছিত মহানামে কে আমার মৃতদেহে জীবনী-সঞ্চার করিল! আজ যেন, স্বর্গের অমৃত-বর্ষণে সে আমাকে অভিষিক্ত করিল! দেখতো, দেখতো! কে আমাকে নিরাশা-সাগরে ডুবিতে ডুবিতে সহসা উদ্ধার করিল! সে যেন এই চির-ভিখারীকে অযাচিত-ভাবে মহানিধি নিবেদন করিল!! দেখ, দেখ! তোমরা শীঘ্র সেই মহাশয়ের অনুসন্ধান কর।"

অমনি চতুর্দ্দিকে অসংখ্য অনুচরবর্গ অনুসন্ধানে ধাবিত হইল! কেহ কেহ আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, কেহ কেহ বা বনপথে ধাবিত হইল!! সকলেই উৎকর্ণ হইয়া ছুটিয়াছে! কাহারও মনে অন্য চিন্তা নাই!

হেন কালে, ঐ দেখ! সুমধুর গম্ভীর উচ্চ ধ্বনি যেন সুধাসিন্ধু মথিত করিয়া আসিয়া পৌঁছিল!! ঐ দেখ—

শ্রীরাম, শ্রীরাম জয়, জয় "রাম, রাম"!
উচ্চনাদে গান করি আসে হনূমান্!!
হেন বুঝি হনূমান্ বলিছে জগতে।
আর ভয় নাই, ভাই! "রাম" এলো দেশে!!

ভক্তগণের হৃদয়ে বিরহ-অনল নিভাইতে স্বয়ং ভক্তবীর হনূমান্ "রাম-আগমন-বাণী" লইয়া অমৃত সিঞ্চন করিতে ঐ যে আকাশ-পথে দৃশ্যমান!

গুহরাজ প্রেমানন্দ-সাগরেতে ভাসে।
হিয়া কাঁপে "দুরু দুরু", কথা নাহি আসে॥

ভক্ত গুহরাজ তখন আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—

"পশুর আকৃতি, কিন্তু প্রকৃতি সরস।
" রাম নাম করে গান হইয়া অবশ॥

রামপ্রেমে "ডগমগ" ধীর-চূড়ামণি।
সাধু সাধু, ধন্য ধন্য ইঁহার জননী॥
ধন্য ধন্য! ইঁহার "বালাই" নিয়ে মরি।
বুঝি মোর শ্রীরামের দূত, বলিহারি!!

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গুহরাজ ঊর্দ্ধমুখ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হনূমৎপতিকে সম্বোধন করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

কে তুমি হে, ওহে বন্ধু! অপার করুণা সিন্ধু!
ভুবনপাবন-শিরোমণি!
ওহে ভাই! ওহে পিতা! ওহে নাথ, ওহে ত্রাতা!
ওহে রামচন্দ্র-প্রেমে ধনী!
কে তুমি হে, ওহে ভাই! তোমার তুলনা নাই!
"বালাই" লইয়া তব মরি!
এস এস তোমা' দেখি, হৃদয়-মাঝারে রাখি
বাস কর দেহ-মন ভরি'।
"রাম-নাম" কি শুনা'লে! কি সুধা শ্রবণে দিলে!
জুড়াইল প্রাণ, মন, দেহ।
জন্মে জন্মে একেবারে, কিনিয়া লইলে মোরে
তনু-মন-জীবনের সহ॥
এস, এস, এস ভাই! হৃদয়-বেদী যে এই!
ব'স তা'হে শ্রীচরণ দিয়া।
কোটি জন্ম-পুণ্যবারি, অঞ্জলি অঞ্জলি ভরি'
তাহে দিই পাদ ধোয়াইয়া॥
হনূমান্ মহামতি, হেরিয়া তাঁহার গতি
সবিস্ময়ে চাহিয়া রহয়!

(ভাবে) কেবা এই মহাশয়, কিবা মতি সদাশয় !
কিবা প্রেম-ভাবের উদয় !!
এই যে পুরুষবর, রামচন্দ্র-অনুচর
প্রিয়তম-শেখর-উত্তম।

মোদের যে অভিমান, ভকত বলিয়া জ্ঞান
বৃথা করি আজ বুঝিলাম্॥
আসিবার কালে মোরে, প্রভু গদগদ স্বরে
প্রেমভরে কহে কত করি'।

"গুহ"-নামে ভীলরাজে, যাইতে বনেরি মাঝে
সম্ভাষিয়া যা'বে "রঘুপুরী"॥
শীঘ্র গিয়া তা'র সনে, মিলিবে সানন্দ-মনে
"শীঘ্র আমি আসিতেছি" ক'বে।

এই সেই মহামতি, বুঝিনু দেখিয়া রীতি
প্রভুর সে প্রিয়তম হ'বে॥
ইহা ভাবি শীঘ্রগতি, নভঃ হ'তে নামি' ক্ষিতি'
প্রেমভাবে পুলকিত হ'য়ে।

দুই বাহু প্রসারিয়া, ছুটিয়া তাহারে গিয়া
আলিঙ্গিল সকলি ভুলিয়ে॥
দোঁহে দোঁহা' হৃদে ধরি', গাঢ় আলিঙ্গন করি'
মূরছিত হইয়া পড়িল।

ক্ষণেক বিলম্ব পরে গুহ কহে ধৈর্য্য ধ'রে
কহ "রাম" কোথায় রহিল ?
হনূমান্ কহে "ভাই" ! আর তব দুঃখ নাই
তোমার "পরাণ" রামচন্দ্র।

জনকনন্দিনী সীতা, বামপার্শ্বে সুশোভিতা
সহিত লক্ষ্মণ-ভক্তবৃন্দ ॥
পুষ্পক-বিমানোপরি, আকাশ-পথেতে "হরি"
আসিতেছে এখনি পাইবে।
মনে কর যে আশ্বাস, এখনি পূরিবে আশ
নাচ, গাও, সব দুঃখ যা'বে।
এত শুনি' গুহবরে, আনন্দ না প্রাণে ধরে
পরিবার সহিত মাতিল!
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ ভূমে গড়ি' যায়
প্রেমানন্দ-তরঙ্গ উঠিল!!
নানামত বাদ্য বাজে, বাহু তুলি গুহরাজে
উদ্দণ্ড নাচয়ে কুতূহলে।
উঠি' পড়ি' গ'ড়ি যায়, ক্ষণে স্তব্ধ হ'য়ে রয়
"জয়-রাম," ঘন ঘন বলে।
কেহ শুভাচার করে', ঘট পাতে দ্বারে দ্বারে
কদলীর বৃক্ষ থরে থরে।
চন্দ্রাতপ শত শত, পতাকা উড়য়ে কত
পুষ্পমালা মুকুতার হারে ॥
দীপমালা সারি সারি, চন্দনে সিঞ্চিত পুরী
ক্ষালন-লেপন-সংস্কারে।
এইমত সুমঙ্গল, করি সবে কোলাহল
আনন্দেতে আপনা' পাসরে ॥
যে পথে আসিবে রাম, বাঞ্ছিত মনের কাম
সেই দিকে নয়ন রাখিয়া

যেমন চাতকগণে, জলধর-আগমনে
রহে সবে তেমনি চাহিয়া ॥
হেন কালে অতিদূরে, পুষ্পক-বিমানোপরে
ধ্বজার আভাস দেখা গেল।
কেহ বলে "দেখ ওই", কেহ বলে "কই কই" ?
কেহ বলে "দেখিতে নারিল" !!
কেহ বলে "অই অই", "ধ্বজা দেখিয়াছি মুঞি"
কেহ বলে "অই কই" বল !
কিবা বাল-বৃদ্ধ সবে, ছুটাছুটি মহোৎসবে
কোলাহল নগরে বাড়িল !!
হেন কালে চন্দ্রানন, সঙ্গে পারিষদগণ
গুহরাজ-প্রাসাদের মাঝে।
উদয় হইল আসি', দয়ার জোছনারাশি
রামবীর, ভকত-সমাজে ॥
গগনে চন্দ্রমা-করে, শুধু অন্ধকার হরে
রামচন্দ্র হৃদয় তিমির !
প্রেমের বিমল শশী, সকল কলুষ-রাশি
সমূলেতে দেয় করি দূর !!
সহাস্য কটাক্ষ সুধা, হরে জগতের ক্ষুধা
ঝরে আজ ভীলরাজোপরি।
(গুহের) বিরহ-বাড়বানলে, প্রেমানন্দসিন্ধু-জলে
নিভাইল করুণা বিস্তারি ॥
দয়াল পরমানন্দ, প্রেমাধীন রামচন্দ্র
ভকতের "প্রাণ" গুণধাম।

প্রিয় "ভক্তরাজ" গুহ, হেরিয়া পুলকদেহ
হৃদয়ে ধরিল "প্রাণারাম" ॥
গাঢ় আলিঙ্গনে দোঁহে, প্রভু ভৃত্যে লাগি রহে
অশ্রুজলে দোঁহা' অঙ্গ ভিজে !

ধন্য গুহ মহাশয় ! চারিদিকে "জয় জয়" !
কোলাহল বাড়ে ধরামাঝে ॥
স্বর্গ হ'তে দেবগণ, করে পুষ্প-বরিষণ
চমকিত-চিত্ত মনে মনে।

কহে, অহো ! কিবা ভাগ্য ! কত যোগ্য, কি সৌভাগ্য !
এই ভক্ত শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনে !!
দুন্দুভি-বাজন বাজে, আনন্দে অপ্সরা নাচে
প্রশংসয় ত্রিভুবন-লোক।

"রাম" অনুকূল যা'রে, কেবা নাহি পূজে তা'রে ?
সেই হয় ত্রিলোক-আলোক ॥
কি অলভ্য তা'র আছে, চতুর্ব্বর্গ তা'র পাছে
ফিরে, তা'র নাহি দৃষ্টিপাত !

কি ধনে অভাব তা'র ত্রিলোকের ধন-সার
প্রাপ্ত সেই, "রাম" যা'র নাথ ॥
আনন্দে মগন হিয়া, কেহ আসে জল নিয়া
কেহ সুখে চামর ঢুলায়।

কেহ রাজসিংহাসনে পাতিয়া কমলাসনে
কোলে ধরি' প্রভুরে বসায় ॥
পারিষদগণ সহ সমান পিরীতি-স্নেহ
সমান ভকতি-সহ সবে।

দিব্য রত্ন, ভোজ্য, বাসে, নিবেদিয়া পীতবাসে
প্রেমনীরে প্রাণভরি' সেবে ॥
সুগ্রীবাদি কপিগণ, বিভীষণ জাম্বুবান্,
আর যত পারিষদ-চয়।
গুহরাজ-প্রেম দেখি, অনিরাম ঝরে আঁখি
পরস্পর বহু প্রশংসয় ॥
(বলে) প্রভুর যতেক ভক্ত, সর্ব্ব-মধ্যে অতিরিক্ত
এই জন প্রিয়তম হ'বে।
ইঁহার যে প্রেম দেখি, জুড়ায় হৃদয়-আঁখি
যা'র বলে "রামচন্দ্র" লভে ॥
নিধি' ভব, পুরন্দর -আদি দেব-দেবী-নর
পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব কিন্নরে।
সকলে আনন্দ পায়, নিরন্তর গুণ গায়
"জয় জয়"! "ধন্য ধন্য"! করে ॥
জাতি-কুল-বিদ্যা-তপ কর্ম্ম-জ্ঞান-ব্রত জপ
কিছুর অপেক্ষা নাহি করে।
রঘুনাথ-পদাশ্রয়, কোনো মতে যেই লয়
ত্রিপাবনী শক্তি সেই ধরে ॥
তা'র পদধূলি-স্পর্শে, কোটি মহাপাপ ধ্বংসে
ভুক্তি-মুক্তি থাক্ বহু দূরে।
দুর্লভ যে হরিভক্তি, ক্ষণমাত্রে দিতে শক্তি
একমাত্র এই ধূলি পাবে ॥

হে ভক্তবীর গুহরাজ! ত্রিতাপদগ্ধ আমরা' সাষ্টাঙ্গ-প্রণিপাতসহ মহাভয়নাশি

তোমার শ্রীচরণে এইমাত্র করুণা ভিক্ষা করি যেন জন্মজন্মান্তরেও তোমার চরণারবিন্দে আমাদের বিস্মৃতি না ঘটে।

শ্রীশ্রীসুদামাজীর চরিত্র।

অতি দরিদ্র শ্রীশ্রীসুদামা বিপ্রের কথা অতীব চমৎকার ও সুমধুর—স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণও ইঁহার একমাত্র সম্বল সামান্য তণ্ডুলকণাকেও অভিপ্রেত ভক্তি-নিবেদন-স্বরূপ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্য করিয়াছেন।

এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভিক্ষার দ্বারা উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া বহু কষ্টে সস্ত্রীক সংসার-ধর্ম্মাচরণে রত থাকিয়া দিনপাত করিতেন। কোনো কোনো দিন ভিক্ষার অভাবে তাঁহাদিগকে উপবাসেও থাকিতে হইত। এইভাবে দুঃখ-কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে কাতর হইয়া তাহার বুদ্ধিমতী, সুশীলা গৃহিণী তাঁহাকে একদিন বলিলেন—"দেখ প্রভু! আমাদের নিত্য অভাবগ্রস্ত এই সংসারে তোমার দুঃখ আমার হৃদয়ে আর সহ্য হয় না—চল চল, আমরা দ্বারকাপতি, দারিদ্র্যভঞ্জন, তোমার সখা কৃষ্ণসুন্দরের শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করি; তাহার কাছে যাইলেই আমাদের সকল দুঃখের অবসান হইবে"।

ব্রাহ্মণ এত শুনিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! বাস্তবিকই তুমি আজ বড় সত্য কথা আমায় স্মরণ করাইলে! সাংসারিক নানা বিষয়ে মনকে বহির্ম্মুখী রাখিয়া আমি আমার অন্তরের ঠাকুরকে ভুলিয়া ছিলাম—সেইজন্যই পরম কৃপালু, হৃদয়বিহারী, সখা কৃষ্ণধন দারিদ্র্যদুঃখের কশাঘাতে আমার চৈতন্যসঞ্চার করিতে চিরজাগ্রত আছেন!!

তোমার এই পরামর্শে আমি পরমানন্দ লাভ করিলাম; আমি শীঘ্রই যাইতেছি—আমাদের প্রাণগোবিন্দের জন্য হৃদয় আমার উদ্বিগ্ন হইতেছে—তুমি অপেক্ষা কর—অবিলম্বে আমি ফিরিয়া আসিব।

ভক্তচূড়ামণি, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ, একাকী কত আগ্রহে

কৃষ্ণসম্মিলনে চলিলেন—ঘরে তো সখাকে নিবেদন-যোগ্য কিছুই নাই, তবুও ভিখারীর ঘরে সামান্য যাহা কিছু তণ্ডুলকণা ছিল তাহাই ভক্তিভরে ছিন্ন অঞ্চলের কোণে বাঁধিয়া লইয়া সংকুচিত-চিত্তে চলিলেন্ !!!

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অনাহারে, অনিদ্রায়, পথক্লেশে কাতর হইয়া "হা কৃষ্ণ, হা সখা, হা যাদব" বলিতে বলিতে কক্ষে "খুদের পুঁটুলি" বহিয়া কিছুদিনে দ্বারকা-ধামে উপনীত হইলেন। এখানে আসিয়া দ্বারকা-পতির পুরার সৌন্দর্য্য দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া মনে করিলেন "আমার সখারই কি এত বিপুল ঐশ্বর্য্য ! আমি তো তাহা জানিতাম না !!! নিশ্চয়ই তবে, এত সমস্ত ঐশ্বর্য্য রাশির স্বামী কোনো রাজতুল্য ধনকুবের হইবেন।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে শুধু ক্ষুধার যাতনা-নিবারণ-মানসে তিনি কম্পিতপদে, ধীরে ধীরে রাজপুরীর দ্বারদেশে "হা কৃষ্ণ, হা সখা" বলিয়া রোদন করিতে করিতে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সকলেই জানিত এই রাজপুরীতে ব্রাহ্মণের জন্য দ্বার সর্ব্বদাই অবারিত; কাজেই, রাজভৃত্য সকলে এই ব্রাহ্মণের মুখে স্বয়ং দ্বারকাপতির জন্য আর্ত্তনাদ শুনিয়া বহুসমাদরে অন্তঃপুরে যেখানে কৃষ্ণচন্দ্র লক্ষ্মীঠাকুরাণীর সহিত রত্নসিংহাসনে বসিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, সেইখানে তাঁহাকে লইয়া গেলেন।

রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তি দেখিয়া এই ব্রাহ্মণ মহাভাবের আবেশে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িতেই কৃষ্ণসুন্দর তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গনভরে তুলিয়া ধরিলেন এবং বহু প্রিয়বাক্যে তাঁহার সান্ত্বনা-বিধান করিয়া মঙ্গলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—বহুপূর্ব্বে উভয়েই গুরুগৃহে একত্র অধ্যয়ন করিতেন এবং পাকের জন্য একত্র কাষ্ঠ পর্য্যন্ত আহরণ করিতেন !!! প্রসঙ্গক্রমে সেই

সমস্ত পুরাতনী কথার আলোচনায় তাঁহাদের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল।

অনন্তর অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ এই ব্রাহ্মণ-সখার কক্ষে একটী "পুঁটুল" দেখিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "সখা! তোমার "বগলে" ওটা কিসের পুঁটুলি ভাই?" ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণের এই অতুল রাজসম্পৎ দেখিয়া সঙ্কোচের ভরে সখার জন্য আনীত এই সামান্য ভক্তি-নিবেদন কাপড়ের মধ্যে ঢাকিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিলেন "সখা! ওটা ভাই, এমন কিছু দ্রষ্টব্য নয়।" এই বলিয়া অন্যমনস্ক হইয়া তিনি এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন।

ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের এই ঔদাস্যের সুযোগে ভক্ত-বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য রহস্যভরে ভক্তের বগল হইতে তাঁহার শ্রদ্ধার অঞ্জলি অলক্ষ্যে টানিয়া লইয়াই তাহা হইতে এক মুষ্টি তণ্ডুল তুলিয়া নিজের মুখে দিলেন এবং আর এক মুষ্টি স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে দিলেন। ভক্ত সুদামা তখন অতি অপ্রতিভ হইয়া করযোড়ে এই সামান্য নৈবেদ্য-সেবন হইতে **সখাকে** বিরত হইতে মিনতি করিতে লাগিলেন। ওদিকে, প্রভু কৃষ্ণসুন্দরও ভক্তের সামান্য নৈবেদ্যের মহিমা প্রকাশ করিয়া ভক্তকে ধন্য করিলেন। শেষে ভক্তের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সেবার ব্যবস্থা হইল।

এই ভাবে ভক্তপ্রবর সুদামা তাঁহার প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকাপুরীতে কয়েক দিবস সখ্যরসে, প্রেমানন্দে বিহার করিয়া ঘরে ফিরিবার জন্য বিদায় লইয়া চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে সংসারের অভাব ও দুঃখের কথা মনে করিয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন "সখা তো আমার যথেষ্ট সম্মান ও সমাদর করিলেন, কিন্তু, অর্থসম্বল কিছুই তো অকিঞ্চন আমাকে

দান করিলেন না!! ওদিকে ঘরেও তো এমন কোনো সম্বল নাই যাহাতে আমাদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা ঘটে!! রিক্তহস্তে আমাকে ঘরে ফিরিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণী-ই বা কি মনে করিবেন! আমারই বা বলিবার কি আছে?”

এই ভাবিতে ভাবিতে নিশাশেষে নিজ গ্রামে উপস্থিত হইয়া আপনার আবাস-ভূমিতে নিজের গৃহ না দেখিয়া তিনি চমকিত হইয়া অবসন্ন মনে হতচেতন-প্রায় ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন! কিছু পরে চিত্ত একটু স্থির হইলে তিনি চাহিয়া দেখিলেন তাঁহার বাসভূমির উপর সুরম্য অট্টালিকা নানাবিধ সাজসজ্জায় সজ্জিত, শত শত দাসদাসীদ্বারা পরিবেষ্টিত, চতুর্দ্দিক সুরভিত পুষ্পবৃক্ষে সমাকুল ও কলকণ্ঠি-বিহঙ্গ-কূজনে নিনাদিত!!!

এই সমস্ত দেখিয়া তিনি মনে করিলেন—“নিশ্চয়ই কোনো ধনকুবের এই স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন”, কিন্তু গৃহিণীকে তথায় কোনো স্থানে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন-চিত্তে খেদোক্তি করিতে করিতে অবসন্ন হৃদয়ে শেষে নারবেই তথায় বসিয়া তিনি অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, অল্পক্ষণ পরেই এই ব্রাহ্মণ-গৃহিণী শত শত দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া স্বামীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে যথাপূর্ব্ব সমাদরের সহিত আহ্বান করিলেন। বিপ্র সুদামা এই মহীয়সী নারীকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে পরিচয়-জিজ্ঞাসায় শুনিলেন তিনিই স্বয়ং তাঁহার ধর্ম্মপত্নী—লক্ষ্মীনারায়ণের অশেষ কৃপায় স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মা আসিয়া এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য পূর্ণ ধনধান্য-বহুল সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর, মনোহর অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন!!!

ভক্ত সুদামা এতক্ষণে বুঝিতে পারিলেন “কেন দ্বারকাপুরী হইতে আসিবার সময় তাঁহার প্রাণসখা কৃষ্ণসুন্দর তাঁহাকে হাতে

ধরিয়া কোনো অর্থসম্বল দান করেন্ নাই” এবং এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ মহাভাবের আবেশ হইতে লাগিল। পরে শ্রীকৃষ্ণের লীলায় স্বামিস্ত্রী উভয়ে পুনর্যৌবন লাভ করিয়া নানা বিষয়-ভোগান্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসাগরে সমাধিস্থ হইয়া ভূমানন্দ-লাভে ধন্য হইলেন—তাঁহাদের জন্ম, জরা-মৃত্যু রোগ-শোক সমস্ত চিরকালের নিমিত্ত বিনষ্ট হইল।

সাধু সুদামা-বিপ্র-দম্পতীর চরণ-সরোজ
ভবদুঃখমগ্ন আমাদের নিত্য
সহায় হউক।

শ্রীশ্রীখোজেজীর চরিত্র।

পরম ভাগবত শ্রীশ্রীখোজেজী বহুকাল শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় সাধনা করিতে করিতে বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে আপনার শিষ্যগণকে বলিলেন "বৎসগণ! এখন আমার ইহকালের বিষয়ভোগ-তৃষ্ণা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছে; কাজেই, এখনই আমাকে দেহত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে যাইতে হইবে। দেহান্তেই তোমরা যথারীতি আমার মৃতদেহের সৎকার করিও—কিন্তু আমার বৈকুণ্ঠধামে প্রবেশ হইল কি না—এ বিষয়ে তোমাদিগকে নিঃসন্দেহ করিবার মানসে "এইমাত্র সঙ্কেত বলিতেছি" মনে রাখিবে—"বৈকুণ্ঠধামে আমার প্রবেশমাত্র সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মধ্যে এই স্থানে শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য আপনি-ই বাজিয়া উঠিবে"; এই সঙ্কেত পাইবার পর তোমরা আমার মৃতদেহের সৎকার করিবে—বলিয়া রাখিলাম।

এই বলিয়াই সাধু খোজেজী দেহত্যাগ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্কেত-অনুযায়ী কিছু দীর্ঘকালের মধ্যেও শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি না শুনিয়া অনুগত শিষ্যগণ ইহার কোনো কারণ নির্ণয় করিতে না পারিয়া অতীব দুশ্চিন্তায় কাতর হইয়া তৎক্ষণাৎ দূর গ্রামান্তরে তাঁহাদেরই এক অতি অন্তরঙ্গ, যোগসিদ্ধ ও ভক্তিমান্ পরমার্থ-ভ্রাতার নিকট এই দুঃসংবাদ পাঠাইলেন। তিনিও এই সংবাদ প্রাপ্তি-মাত্র অবিলম্বে নিজ গুরুর দেহত্যাগ-ক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কার্য্যকারণ বিচারপূর্ব্বক পরমার্থ-ভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ভ্রাতৃগণ! আমাদের গুরুদেবের বৈকুণ্ঠলাভের সঙ্কেত তোমরা যে পাও নাই তাহার বিশেষ কারণ আছে—এখনই দেখিবে তাহার মীমাংসা হইবে—তোমরা দুশ্চিন্তা পরিহার করিয়া আমার

কথায় কর্ণপাত কর। শোনো শোনো! আমি কারণ নির্দ্দেশ করিয়া ব্যবস্থা দিতেছি, শোনো!—

"এই দেহত্যাগকালে জীবাত্মার মনে যে কোনো ভোগেচ্ছার উদয় হয় তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ভোগেচ্ছা-পূরণের অনুকুল দেহে, মনের সম্পূর্ণ বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মার পুনঃপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী; যেমন, এই জীবনকালেই তোমরা দেখিতেছ—আমাদের বাল্যদেহে অবস্থিত জীবাত্মার মন, কৌমার ও যৌবনদশার ভোগেচ্ছায় বৰ্দ্ধিত হইবার পরই স্বভাবতঃ যথা-সময়ে সেই বাল্যদশারই পরিবর্ত্তিত কৌমার ও যৌবন দেহে সেই একই জীবাত্মার সহিত বিষয়-ভোগের পূরণ করিতে থাকে। ভোগান্তেও আবার সেইভাবেই নিঃশেষে সর্ব্বভোগের বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত সেই একই জীবাত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি ঘটিতে থাকে। কিন্তু, গুরুদেবের কৃষ্ণভজনগুণে সকল কর্ম্মের নিঃশেষে খণ্ডন হইয়াছে সন্দেহ নাই, কেবল ঐ আম্রবৃক্ষতলে দেহত্যাগ-কালে বৃক্ষের উপর সুপক্ব একটী আম্র সহসা দেখিতেই তাঁহার মনে আম্র-ভোগের আকর্ষণ জন্মিল। এই আকর্ষণ-গুণে বাধ্য হইয়া স্বভাবতঃ তাঁহার মন জীবাত্মার সহিত ঐ সুপক্ব আম্রের মধ্যে **কীটদেহে** বাস করিতেছে—ঐ আম্রটী বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া এবং কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিলেই "সত্যামিথ্যা" প্রত্যক্ষ করিবে!!"

তত্ত্বজ্ঞানী, সাধু পরমার্থ-ভ্রাতার এই যুক্তি-পূর্ণ কথায় শ্রীশ্রীখোজেজীর শিষ্যবর্গ তাঁহাকে "ধন্য ধন্য" করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশ-অনুযায়ী অতীব কৌতূহলভরে সুপক্ব আম্রটী বৃক্ষ হইতে পাড়িয়া দ্বিখণ্ড করিতেই তাহার ভিতর হইতে কীটরূপী খোজেজীর জীবাত্মা কীটদেহ ত্যাগ করিলেন—এদিকে দিব্যরূপ, শ্যামকলেবর, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্র-গদাপদ্মধারী, বনমালী কৃষ্ণসুন্দর

স্বর্ণবিমানে বিরাজমান অবস্থায় সেই স্থানে আসিয়া স্বকীয় তেজঃপুঞ্জে চতুর্দ্দিক প্রতিভাসিত করিয়াই অন্তর্হিত হইলেন সঙ্গে সঙ্গেই চতুর্দ্দিকে শঙ্খ-ঘণ্টা প্রভৃতি বাদ্য আপনি-ই বাজিয়া উঠিল !!! গুরুদেবের স্বর্গারোহণ-সঙ্কেত পূর্ণ হইল দেখিয়া শিষ্যবর্গ মহান্ আনন্দভরে "হরিধ্বনি" করিয়া উঠিলেন এবং মহোৎসব-রঙ্গে নামসঙ্কীর্ত্তনের সহিত গুরুদেবের মৃতদেহ সমাহিত করিলেন ।

শিষ্যবর্গ এখন সকলেই বুঝিলেন—ভক্তবৎসল কৃষ্ণসুন্দর তাঁহার ভক্তকে বিষয়-ভোগ করাইয়া কেমন সহজেই নিজধামে লইয়া যান্ ! কৃষ্ণভক্তির গুণে জীবের কি ভাবে প্রারব্ধনাশ ঘটিয়া থাকে সাধু খোজেজীর এই আখ্যায়িকা হইতে সে বিষয় সহজে বোঝা যায়, কেন না, কীটদেহ হইতে দেহান্তর প্রাপ্তি যুক্তি-অনুযায়ী গ্রাহ্য হইলেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং এখানে সারথিরূপে ভক্তের দিব্যধাম-যাত্রায় সহায় হইলেন !!! ইহা হইতে ভক্তের উচ্চ আশা আর কি থাকিতে পারে ?

সাধু খোজেজীর শ্রীচরণপদ্মে আমাদের মতি সতত স্ফুরিত হউক।